মৌচাকে ঢিল

—রাজনৈতিক তর্কনাট্য—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

বাংলা রঙ্গমঞ্চে

'জানি, কিন্তু বলব না'

কোন লোক আমাদের দেশের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে বিশেষ একটা থিয়েটারের পথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; তিনি উক্ত থিয়েটারের পথ জানিতেন, তৎসত্ত্বেও বলিয়াছিলেন, 'জানি, কিন্তু বলব না।' সেই হইতে গল্পটা শিক্ষিত সমাজে উক্ত ব্যক্তির পিউরিটানিক রুচির পরিচয় বহন করিয়া হাস্যোদ্রেক করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ বুঝিতে পারিতেছি, কতখানি ঋষিদৃষ্টি এই উক্তির মধ্যে লুকানো ছিল। বাংলা দেশের থিয়েটারের পথ দেখাইয়া দিবার পথ নয়।

বাংলা থিয়েটার যাত্রা-গীতির জারজ সন্তান; যাত্রা ও সার্কাসের সঙ্গমে এর উৎপত্তি; ভদ্র সমাজে নাম ভাঁড়াইয়া নাট্যশিল্প নামে এ পরিচয় দিয়া থাকে। বাংলা নাট্যশিল্পের (সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় হইয়া থাকে) আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পিতৃপরিচয় অত্যন্ত উগ্রভাবে স্পষ্ট।

প্রকৃত নাট্যশিল্পের উপজীব্য মুখ্যত বাক্-কলা; অ্যাক্শন অত্যন্ত গৌণ; 'এস্কাইলাস' হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম আমার নাটক পর্য্যন্ত তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে; এমন কি, শেক্সপীয়রের নাটকে অ্যাক্শনের যে অত্যন্ত প্রাধান্য আছে মনে করা হয়, বস্তুত তা সত্য নয়; শেক্সপীয়রের নাটকের পূর্ণোচ্ছ্বাসিত বাক্-সঙ্গীতের তুলনায়, অ্যাক্শন অত্যন্ত গৌণ; তারও অধিকাংশ আবার মূর্খ দর্শকদের নিকট হইতে করতালি ও অর্থ আদায় করিবার ফিকির মাত্র। শেক্সপীয়রের

অ্যাকৃশনের বেশির ভাগই তৎকালের জন্য ; কিন্তু চিরকালের জন্য ধ্বনিত হইতেছে তাঁর ধ্বনি সঙ্গীত। শেক্সপীয়রের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজী নাটকর মধ্যে মূল প্রভেদ এইখানে। তাতে ভালুক-নাচ হইতে আরম্ভ করিয়া শোভাযাত্রা, ভাঁড়ামি সবই স্থান পাইত ; অ্যাকৃশন ছিল মুখ্য, বাণী ছিল গৌণ ; শেক্সপীয়র অভ্রান্ত শিল্পীদৃষ্টির ফলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাণীর ঘাড় হইতে অযথা অ্যাকৃশনের ভার নামাইয়া ফেলিয়া তাকে মুক্ত গতি করিতে হইবে ; আবার এই মুক্তগতি বাণীই শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল।

বাংলা থিয়েটার এখনও শেক্সপীয়র-পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় আছে। বাণী এখানে তথাকথিত অ্যাকৃশনের দ্বারা পদে পদে প্রতিহত ; ভারগ্রস্তা বাণী ভাঁড়ামিকে রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে তাম্বুলকরঙ্ক বাহিনীর কাজ করিতেছে ; বাংলা নাট্যশালার বিরাট প্রাসাদে দ্রৌপদী আজ সৈরিন্ধ্রী।

নাট্যশিল্পের দিক দিয়া বাঙালী আজও শিশু ; চোখের উগ্র বাস্তবতা ছাড়া শিশুর আর কিছুতে বিশ্বাস নাই ; সেইজন্য নাটক বা সিনেমা-চিত্রের বিজ্ঞাপনে চিত্রগৃহের উপরে কার্ডবোর্ডের দৃশ্য খাড়া করিয়া দিতে হয়—বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী জলপান করিতেছে ; আলিবাবার গাধার পিঠে মোহরের থলি। এ তো গেল রঙ্গমঞ্চের বাহিরের কথা। রঙ্গমঞ্চে যে সব অলৌকিক দৃশ্য দেখানো হয়, আমাদের সমালোচকদের মতে তার নাম লোমহর্ষণ কাণ্ড।

কোন রঙ্গমঞ্চে সপ্ততালভেদ চলিতেছে, কোথাও ভয়ঙ্কর প্রলয়ে বাড়ি-ঘর ধসিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা পাতাল ভেদ করিয়া হোস-পাইপের গঙ্গা কলকল শব্দে উঠিতেছে ; আর সে কি কর্ণবধির করা করতালি !

বাংলার নাট্যজগতে সেই শেক্সপীয়রধর্ম্মী লেখক কি জন্মিবে না, যে অযথা ভার ও ভাঁড়ামি হইতে বাণীকে উদ্ধার করিতে পারে? এমন প্রযোজক কি জন্মিবে না, যে কীচকরূপী তথাকথিত প্রযোজককে বধ করিয়া সৈরিন্ধ্রীকে রক্ষা করিতে পারে?

কিন্তু খবরের কাগজের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে এ দেশের সব নাটকই মহানাটক, সব ফিল্মই মহাফিল্ম; কোনটাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়। নিজের চোখে দেখিয়া এস—(যদি চোখ থাকে) অধিকাংশই অপদার্থ রচনা। তবে কি সংবাদপত্র মিথ্যা কথা বলে? (কি সর্ব্বনাশ! এ যে রাজদ্রোহ! সংবাদপত্র বর্ত্তমান কালের রাজা।) আসল কথা, সংবাদপত্র নির্ভর করে সত্যের উপরে নয়, বিজ্ঞাপনের উপরে। সিনেমা ও থিয়েটার পাতা-ভরা বিজ্ঞাপনের রূপার কাঠি বুলাইয়া, সাংবাদিকদের সত্য-মিথ্যা জ্ঞানকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, কাজেই সমালোচনার নামে যা বাহির হয় তা নির্জ্জলা মিথ্যা। (একেবারে নির্জ্জলা নয়, সঙ্গে দুধ আছে—টাকা।) সিনেমা ও থিয়েটার বিজ্ঞাপনের আকারে নগদ টাকা ঢালিতেছে, আর সংবাদপত্র (অন্যের মিথ্যা সম্বন্ধে যারা সর্ব্বদা সচেতন) কল্পনা ও কথার সাহায্যে সে ঋণ শোধ করিতেছে। রসিকতা করিবার মত মনের অবস্থা হইলে সংবাদপত্রের মুখ দিয়া সিনেমা-থিয়েটার কোম্পানীকে বলাইতাম—

> "সত্য রত্ন দিলে তুমি পরিবর্ত্তে তার
> কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।"

থিয়েটারের নূতন বিপদ

থিয়েটারের নূতন বিপদ সিনেমা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, থিয়েটার এই বিপদকে এড়াইয়া না চলিয়া ঘেঁষিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সিনেমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা বর্ব্বরোচিত, এটা শিল্পই নয়; শিল্পের প্রাণ কল্পনা; কল্পনার প্রাণ অবকাশ—যে অবকাশে দর্শকের মনের যাতায়াতের পথ; সিনেমার তথ্যবহুল পুঙ্খানুপুঙ্খ টেক্‌নিকে কল্পনার স্থান একেবারেই নাই। তবু যে লোকের ভাল লাগিতেছে, তার কারণ অধিকাংশ লোক বর্ব্বর। বড় বড় লোক একে উচ্চশ্রেণীর কলা মনে করিয়া থাকে? তারা উচ্চশ্রেণীর বর্ব্বর, অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর সভ্য। বিখ্যাত লোকেরা একে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করে? এই তো? তবে তারা বিখ্যাত বর্ব্বর। এটিলাও বিখ্যাত।

থিয়েটার লোক ভুলাইবার আশায় (বৃথা আশা) সিনেমার টেক্‌নিককে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে; তার এক পা যাত্রা-গানের আসরে বাংলা দেশে, আর এক পা সিনেমার স্টুডিওতে হলিউডে; এ রকম দুই দেশে দুই পা রাখিয়া দাঁড়াইতে কেবল কলোসাসই সমর্থ। থিয়েটারের পক্ষে তা গ্লানিজনক হাস্যকর।

সিনেমা-টেক্‌নিকের প্রধান অঙ্গ—গতি, এ শিল্প অ্যাক্‌শন-বহুল; থিয়েটারের টেক্‌নিক্ স্থিতি-প্রধান, এর প্রাধান্য অ্যাক্‌শনে নয়, ভাষণে। গোড়াতে যাদের মধ্যে এত প্রভেদ তাদের মধ্যে বন্ধন মিত্রতার নয়, দাসত্বের। থিয়েটার সিনেমাকে অনুসরণ করিতে গিয়া তার ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে।

থিয়েটার যদি বাঁচিতে চায়, তবে তাকে সিনেমার অনুকরণ ছাড়িতে হইবে। তাকে ত্যাগ করিতে হইবে—তথ্যবহুলতা, গতিধর্ম্ম, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবতাকে মঞ্চের উপরে ফুটাইবার চেষ্টা; অ্যাক্‌শনকে কমাইয়া ফেলিয়া সেখানে কল্পনার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কলিকাতায় কয়টি থিয়েটার?

বর্ত্তমানে কলিকাতা শহরে পাঁচটি থিয়েটার চলিতেছে (অর্থাৎ টানিয়া চালানো হইতেছে)। বাংলা দেশে নাট্যকার কয়জন? পাঁচ জনও আছে কি? থিয়েটারের দর্শক কয়জন (কম্‌প্লিমেণ্টারি পাস ছাড়া)? বিপদে ঐক্য প্রয়োজন; কিন্তু মূঢ়েরা বিপদের দিনেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার নামে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। কিছুদিন আগেও তিনটি থিয়েটার ছিল, আজ পাঁচটি; যতই সময় খারাপ হইতেছে, ভাগও তত বাড়িতেছে; এর পরে হরিজনেরা একটি স্বতন্ত্র থিয়েটার খুলিয়া বসিলে বিস্মিত হইব না।

কলিকাতা শহরে এখন বড় জোর দুইটি মাত্র থিয়েটার চলিতে পারে। একটিতে যাত্রা-গীতির জারজ-সন্তান নাটক চলিবে। সেখানে প্রলয়ে বাড়ি-ঘর ধসিয়া পড়ুক, হোস-পাইপের গঙ্গা কলকলনাদে উঠুক, সপ্ততালভেদ হইতে থাকুক; জীবনে যা ঘটে না, তেমন সব জীবনাতীত সত্যের অভিনয় হোক, সংবাদপত্রের ভাষায় যার নাম লোমহর্ষণ কাণ্ড।

কিন্তু আর একটি রঙ্গমঞ্চ থাকুক শিক্ষিত ভদ্রলোকের জন্য, শিক্ষা ও আনন্দের সঞ্চয় যেখানে থাকিবে।

অবশ্য এর প্রধান অন্তরায় কি আমি জানি; দর্শক, প্রযোজক সকলে সমস্বরে বলিয়া বসিবে, 'মশাই, ও রকম থিয়েটার চলিবে না।' আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিবার শক্তি ও-রকম একপেশে থিয়েটারের নাকি নাই।

এ যুক্তি অত্যন্ত পুরাতন—যত পুরাতন মূঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠাহীন লোক। এ বিষয়ে দেশের গভর্মেণ্টের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

সরকারী থিয়েটার

ফ্রান্সে ও রুশ দেশে সরকার কর্তৃক চালিত থিয়েটার আছে; সে সব দেশে যদি থাকে, এ দেশে তার প্রয়োজন সমধিক। প্রস্তাবটা প্রথমে শুনিলে যেমন হাস্যকরভাবে অসম্ভব মনে হয়, অনুধাবন করিলে তেমন মনে হইবে না।

এ দেশে সরকারী কলেজ আছে, সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, সরকারী চিকিৎসা ও এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে, এমন কি সরকারী বেতার-প্রতিষ্ঠানও আছে। এ সবই যদি অসম্ভব না হয়, তবে থিয়েটারের একটা সরকারী সংস্করণ এমন কি অসম্ভব!

আসল কথা, থিয়েটারকে আমরা জাতির আত্মপ্রকাশের অঙ্গ বলিয়া এখনও মনে করিতে শিখি নাই; যারা তা করিয়াছে, তাদের কাছে থিয়েটার ও কলেজ সমমূল্য।

কিন্তু এ কথা বলিব কাকে? বাংলা দেশের রাজনীতির উদ্দেশ্য বহু গুপ্তশিলাসঙ্কুল দলাদলির সমুদ্রে মন্ত্রিত্বের নৌকাখানিকে কোন রকমে বাঁচাইয়া চলা; মন্ত্রিত্ব এখানে কার্য্যসাধনের উপায় নয়, উদ্দেশ্য। দশজনের মন্ত্রিত্ব বাঁচাইবার জন্য পঁয়ত্রিশ জন উপমন্ত্রী (পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী) নিযুক্ত হয়; যদি এমন দিন কখনও আসে যে, মন্ত্রিত্ব নিরাপদ করিতে গিয়া কাউন্সিলের সকল সদস্যই কোন-না-কোন রকম পদে পদস্থ হইবে, তবু বিস্মিত হইব না।

এই যেখানকার রাজনীতির অবস্থা, সেখানে সরকারী থিয়েটার স্থাপন একটা ব্যয়বহুল বিলাসিতা বলিয়া মনে হইবে, অতএব এ অরণ্য-রোদনে অলম্।

কিন্তু ভবিষ্যৎপুরুষের কাছে প্রস্তাব করিয়া রাখিতে আপত্তি কি!

(আমার বিশ্বাস, একশো বছর পরেও আমার গ্রন্থ পাঠকে পড়িবে ; বরঞ্চ সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, একশো বছর পরেই পড়িবে ।)

(১) ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে যেমন ছোট ছোট থিয়েটার স্থাপন করিয়া রঙ্গমঞ্চের নবযুগের (শব্দটি বোধ হয় পাঠকের খুব মুখরোচক) সূচনা করা হইয়াছিল, তেমনই অন্তত ছোট একটি থিয়েটার স্থাপন করা যাইতে পারে ।

(২) প্রয়োগশিল্প শিখিবার জন্য জন দুই তিন যথাযথভাবে শিক্ষিত যুবককে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের থিয়েটারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জন্য পাঠানো প্রয়োজন ।

(৩) এই যুবকদের অশিক্ষতপটুত্বের উপর নির্ভর না করিয়া প্রথমে শিখিবার ব্যবস্থা আবশ্যক । বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিল্প-শিক্ষা বাঞ্ছনীয় । তারা এই শিল্প-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই সরকারী বৃত্তি ভোগ করিয়া বিদেশে যাইবার অনুমতি পাইবে ।

(৪) বিদেশ হইতে শিক্ষার যথারীতি সার্টিফিকেটসহঃ ফিরিলে এই স্বল্পায়তন রঙ্গমঞ্চের ভার তাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, অবশ্য সরকারী তত্ত্বাবধানের অধীনভাবে ।

(৫) মূর্খ দর্শকের দর্শনীর উপর নির্ভর করিতে না হইলে এ রঙ্গমঞ্চ স্বাধীন চালে চলিতে পারিবে, আর স্বাধীন চালে চলিতে শিখিলে তবেই স্বাধীন নাট্যকার, যারা মূর্খ-মুখাপেক্ষী নয়, নিজেদের প্রতিভার নিয়মানুসারে লেখে, তারা লিখিতে আরম্ভ করিবে ।

নাট্য বাস্তবশিল্প ; অন্যান্য শিল্প সৃষ্টির মত বস্তুনিরপেক্ষভাবে এর জন্ম নয় ; এর উদ্ভবের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রের প্রয়োজন । সত্যকার রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়া সৃষ্টি হইলে তবেই প্রতিভাবান নাট্যকারের

আবির্ভাব হয়। (নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া এক আধজন আগেও জন্মিয়া থাকে।)

(৬) এই থিয়েটারের উপর গভর্মেণ্ট ও বিশ্ববিত্থালয়ের সম্মিলিত কর্তৃত্ব থাকিবে; সরকার এর চালনার ব্যবস্থা করিবে; বিশ্ববিত্থালয় লক্ষ্য রাখিবে এর কৃষ্টি বা মনঃপ্রকর্ষের উপর।

(৭) বছরে যতগুলি নাটকের অভিনয় হইবে, তার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দেখা প্রত্যেক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীর পক্ষে আবশ্যিক বিধি হওয়া উচিত।

সংক্ষেপে—এই রঙ্গমঞ্চ জীবন-রঙ্গমঞ্চের ক্ষুদ্র সংস্করণ হইবে; শিক্ষা ও আনন্দের দ্বারা জীবনের জন্য 'সিটিজেন' প্রস্তুত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

আজ এ প্রস্তাবকে বিকৃত কল্পনার বিলাসিতা মাত্র মনে করিয়া পণ্ডিতম্মন্যরা হাসিতে পারে, কিন্তু ডন কুইক্‌সটের যারা সগোত্র, তারা হাস্যকর হইতে ভয় পায় না।

আমার নাটক

আমার পাঠক

আমার নাটকের (বস্তুত আমার রচনা-মাত্রেরই) আটাশ জন পাঠক আছে। (এখন বিপদ এই যে, প্রত্যেক পাঠকই নিজেকে এই আটাশ জনের একজন কল্পনা করে।) কাজেই সমস্যাকে সরল করিবার জন্য বলা যাক, বাংলা দেশের আটাশটি জেলায় আটাশ জন; এতে আর যাই দোষ থাক, পক্ষপাতিত্বের ত্রুটি থাকিবে না।

আটাশ জনের উপর নির্ভর করিয়া লেখা চলে না, আর লিখিলেও

কোন্ প্রকাশক তা প্রকাশ করিবে? কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, এমন একজন দুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসিক প্রকাশক আমার মিলিয়া গিয়াছে, যিনি সংখ্যার উপরে সত্যেকে স্থান দেন।

কার জন্য লিখি?

আটাশ জনের ভরসায় যখন লিখি না, লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে লিখি কার জন্য? অবশ্যই পাঠকের জন্য। সে পাঠক কোথায়? আজও তারা জন্মগ্রহণ করে নাই। আজ হইতে একশো বছর পরে, যখন আজিকার বাংলা দেশের একটি লোকও বাঁচিয়া থাকিবে না, নূতন মানুষে দেশ ভরিয়া যাইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতের জন্য আমার রচনা; আমার সব গ্রন্থকে ভবিষ্যৎমুখী সুদীর্ঘ একটা অরণ্য-রোদন বলা যাইতে পারে। বাংলা দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের প্রতি আমার এমন একটা গভীর ধিক্কারের ভাব আছে যে, তাদের জন্য সাদার উপর কালির আঁচড় দিবার লেশমাত্র ইচ্ছা আমার মনে নাই।

তবে লিখি কেন?

তবে লিখি কেন? মানুষ লেখে কেন? টাকার জন্য? যার পাঠক আটাশ জন, টাকার আশা সে করে না। খ্যাতির জন্য? খ্যাতি কি? যখন অপরিচিত লোকে চিনি বলে, তাকে খ্যাতি বলা যাইতে পারে; আবার পরিচিত লোকে পরিচয় অস্বীকার করিলে সেটা হয় অপখ্যাতি। অপরিচিত লোকের মৌখিক স্বীকৃতির জন্য কেবল মূর্খ ও নিষ্কর্ম্মারা লিখিয়া থাকে; আমার অন্য কারণ আছে।

আমি লিখি আমার মত প্রচারের জন্য, অন্য কোন কারণ নাই।

আমার নাটক, উপন্যাস, কাব্য, কবিতা, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, জীবনী, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও মহাকাব্য এই একটি মাত্র ঐক্যসূত্রে গ্রথিত—সকলেরই মূল উপজীব্য বাঙালীর ইতিহাসের সমালোচনা, বর্ত্তমানের প্রতি ধিক্কার ও অনাগত বাঙালী জাতির প্রতি বিশ্বাস। আমার সমস্ত রচনা দুর্ব্বাসার মত ভস্ম-অভিশাপ দিবার জন্য কেবল প্রস্তুত হইয়া নাই, সর্ব্বদা সে অভিশাপ উচ্চারণ করিতেছে: বাঙালী জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সমুদ্রোপকূলের দেশেই সগররাজার ষাট হাজার সন্তান ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। তারা যে বাঙালী ছিল না, এমন কোন প্রমাণ নাই। এবারে আর ষাট হাজার নয়, ছয় কোটী বাঙ্গালীর ভস্ম-পরিণামের যুগ ;—আশা করি অধিক দিন বিলম্ব নাই। যে অভিনেতা ভূমিকা ভুলিয়া গিয়াছে, বেশভূষা খুলিয়া ফেলিয়াছে, সে যত শীঘ্র সরিয়া গিয়া রঙ্গমঞ্চ অপরের জন্য ছাড়িয়া দেয়, ততই মঙ্গল। বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে নটনাথ অধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে এই অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘায়িত প্রহসনকে পঞ্চমাঙ্কের পঞ্চত্বের দিকে টানিয়া লইতেছেন। দর্শক না বুঝিয়া হাসিতেছে ; মূর্খের হাসি মৃত্যুর যবনিকা না পড়িলে নিরস্ত হইবে না।

ঋণং কৃত্বা—

'ঋণং কৃত্বা'— নামে একখানা নাটক লিখিয়াছিলাম—অতি অপদার্থ রচনা। বাংলা দেশের পণ্য ও অপণ্য অভিনেতার দল সাগ্রহে লুফিয়া লইল ; নাটকের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যেটুকু আশা ছিল, দলের আগ্রহে তাহা অচিরে লুপ্ত হইল।

লোকে খুশি হইল, মূর্খের জন্য মূর্খে লিখিতেছে ভাবিয়া ; বন্ধুরা খুশি হইল, কিছু টাকা পাইব ভাবিয়া ; তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর

সঙ্কেতে একটা কাল্পনিক মুদ্রাকে বাজাইয়া বলিল, এই রকম আর দুই একখানা লেখ, পয়সা মিলিবে।

তখনই সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলাম, আর এমন জিনিস লিখিব না। বন্ধুদের কাল্পনিক মুদ্রা কল্পনাই রহিয়া গেল। স্থির করিলাম, এমন রচনা লিখিব, যা পাঠকে পড়িবে না; প্রকাশকে ছাপিবে না; বন্ধুরা না পড়িয়া বলিবে, বেশ হইয়াছে; মাসিকপত্র না বুঝিয়া সমালোচনা করিবে, চমৎকার; নির্ব্বোধ প্রযোজকেরা বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে গোড়ায় কোপ মারিয়া বলিবে, ওটা নাটক নয়; আর মূর্খেরা কিনিবে না।

এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য খুব বেশী চেষ্টা করিতে হয় নাই; অল্পেই আশাতীতভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছি। '-মৃত- পিবেৎ' আমার পরবর্ত্তী নাটক—অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে; আর বর্ত্তমান নাটকখানাকে সযত্নে এমন দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছি যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, এখন নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আমার পাঠক-সংখ্যা আকাশ হইতে আটে নামিতে বেশি দেরি নাই; তবে সান্ত্বনা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত পাঠক-সংখ্যা তিনের নীচে নামিবে না—কম্পোজিটার, প্রুফ-সংশোধক ও স্বয়ং গ্রন্থকার।

সমস্যা-নাটক

বন্ধুরা উপদেশ দেন, একখানা ঘাতসংঘাতপূর্ণ সমস্যামূলক নাটক লেখ, লোকে তাই চায়, এটা সমস্যার যুগ কিনা। (যদি তর্ক করিতে রাজি থাকিতাম, দেখাইতে পারিতাম যে, এ যুগ মোটেই সমস্যার যুগ নয়। এমন নিঃসামস্যিক যুগ পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। যখন সম্মুখে একটি মাত্র পথ, তখন সমস্যা কোথায়? গড্ডলিকার আবার সমস্যা কিসের? কিন্তু সে তর্ক এখন থাক।)

তাঁরা বলেন, দেখ না কেন, সমস্যামূলক নাটকই এখন রঙ্গমঞ্চের প্রধান খোরাক। আমি বলি, সেটা সমস্যা নয়, অনুবাদ। বিদেশী ঘিকট-নামা নাট্যকারের একখানা নাটক বিকৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচুর পরিমাণে জল (অশ্রুজল) মিশাইয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাইলে তাকে সমস্যা বলে না। অবশ্য একটি সমস্যা আছে, সেটা দর্শকের নয়, ম্যানেজারের—কি করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করা যায়—শুদ্ধ ভাষায় একে বলিতে পারি—গ্রন্থ দ্বারা গ্রন্থিচ্ছেদ। বাংলার রঙ্গমঞ্চে বাঙালীর সমস্যা চাই, কিম্বা মানুষের সমস্যা চাই (দু'টা এক নয়, মনে রাখা দরকার); সেখানে ম্যানেজারের ও প্রযোজকের ব্যক্তিগত আর্থিক সমস্যা দেখিতে কেহ যায় না, অন্তত ফাঁকিটা ধরিতে পারিলে যাইত না।

সমস্যা ও অপসমস্যা

বাংলা নাটকে সমস্যার চেয়ে অপসমস্যারই প্রাবল্য বেশি; দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ দর্শক এই অপসমস্যাকেই নিজেদের সমস্যা ভাবিয়া দুধের পরিবর্ত্তে পিঠালি-গোলা জল পান করে।

'রীতিমত নাটক' নামে একখানা বাংলা নাটক কিছুকাল আগে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; তাতে নাকি সমস্যা ছিল নাটকের উপজীব্য।

এক ব্যক্তির পূর্ব্বের এক বিবাহিত স্ত্রী ছিল; তারপরে সে আর একটি মেয়েকে ভুলাইয়া আনিয়া বিবাহ করে; ঘটনাক্রমে পূর্ব্বের স্ত্রী স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল; সে পিস্তল দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তার স্বামী আসিয়া পড়িয়া পিস্তল কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে; ধস্তাধস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীকে নিহত করে, ঐ সঙ্গে প্রকৃত সমস্যারও মৃত্যু ঘটে।

দুই পত্নী বাঁচিয়া থাকিলে, যাদের একজনের প্রতি হৃদয়ের টান, অপরের প্রতি সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ, সত্যকার একটি সমস্যায় দাঁড়াইত বটে; এবং নাট্যকার কি করিয়া তার মীমাংসা করেন, দেখা যাইত; কারণ ও সমস্যা আমাদের সমাজের একটি ভাবনার বিষয়। কিন্তু সমস্যার মূলে গুলি মারিয়া লেখক সহজে প্রচুর রক্ত ও প্রচুরতর অশ্রুপাত করিয়া একটি pseudo-সমস্যার সমাধানে নাটকের অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই জাতীয় লেখকদের বুদ্ধি 'কথামালা'র সেই কুমীরের চেয়ে বেশি নয়, যে কুমীর শিয়ালের পা মনে করিয়া বটের শিকড় ধরিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচ্য। 'রীতিমত নাটকে' অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য একটি অতি সুলভ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রেক্ষাগৃহের এক অংশ হইতে অধ্যাপক—বাবু (নাম ভুলিয়া গিয়াছি) হঠাৎ অভিনয় দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে; প্রযোজকের মনে হইয়াছিল, এতে বোধ হয় অভিনয় ও প্রেক্ষাগৃহের দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া রসের নিবিড়তা ঘটিবে। অতি সুলভ নবত্বের মোহ ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, এতে রসবোধের হানিই ঘটে। আজ আড়াই হাজার বছর হইতে মানুষে নাটক লিখিতেছে (তার পূর্ব্বে নাটক লিখিত হইলেও পাওয়া যায় না), এই দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতায় মানুষে বুঝিয়াছে, অভিনয় ও দর্শকের মধ্যে যোগ ঘটাইতে হইলে কিঞ্চিৎ দূরত্ব আবশ্যক, যেমন বই পড়িতে হইলে চোখ হইতে কিছু দূরে রাখিতে হয়। ঠিক কত দূরে রাখিতে হইবে, সেটা নির্ভর করে লেখকের প্রতিভার উপরে, তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। তবে মোটের উপরে বলা যায় যে, নাটক শেষ হইয়া গেলেও তার ক্রিয়া দর্শকের মস্তিষ্কে (যদি থাকে) চলিতে থাকিবে,

নাটকের ভাবরূপ বহন করিয়া দর্শক যেন রঙ্গালয় ত্যাগ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা রঙ্গালয়ে দর্শকেরা মস্তিষ্ক বাড়িতে রাখিয়া যায়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কেবল হৃৎপিণ্ড ও চোখ দুইটা কাজ করিতে থাকে।

তর্কনাট্য

এই জাতীয় নাটককে তর্কনাট্য বলা চলে—এক পক্ষে অভিনেতা, অন্য পক্ষে দর্শক; অভিনেতা উচ্চকণ্ঠে, দর্শকে নীরবে বাদপ্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে থাকিবে, এবং অভিনেতার বক্তব্য শেষ হইয়া গেলে দর্শকে সেই তর্কের জের টানিয়া বাড়ি ফিরিয়া অন্য লোকের সঙ্গে তর্কটাকে চালাইতে থাকবে; এই উপায়েই সত্যকার নৈকট্য ঘটিতে পারে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে, কিম্বা লেখক ও পাঠকের মধ্যে। হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিয়া নিরীহ দর্শককে চমকাইয়া দিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়।

কমেডি-শিল্প

প্রত্যেক যুগের একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গি থাকে, সেটা আবার নির্ভর করে সেই যুগের প্রকৃতির উপরে; এক যুগ কাজ করে, পরবর্ত্তী যুগ সে কাজের সমালোচনা করে, অর্থাৎ ভুল ধরে; তার পরবর্ত্তী যুগ আবার সেই ভুল-ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া নূতন করিয়া কাজে নামে। এই বিচারের বৈচিত্র্য অনুসারে কাজের বৈচিত্র্য ঘটে।

শেক্সপীয়রের যুগ ছিল কাজের সময়; সে যুগ বাণী-রূপ লাভ

করিয়াছিল তাঁর ট্র্যাজেডিতে; তাঁর ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্যে ফর্মের ভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির ভেদ নাই; দুই-ই একই যুগের বাণী বহন করিতেছে; তাঁর কমেডি ও ট্র্যাজেডির উৎস মানুষের দুর্দমনীয় কর্ম্মপ্রবৃত্তির দুরূহভাবে উত্তুঙ্গ শিখরে; সে কমেডি ট্র্যাজেডির বিশেষ রসের দ্বারা আবিষ্ট, তাকে বলিতে পারি—ট্র্যাজিক কমেডি; কিম্বা শেক্সপীয়র নিজেই তার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন—কমেডি অব এররস্; তাঁর সব কমেডিই কমেডি অব এররস্; কবি যেন শ্লেষ করিয়া দর্শককে বলিয়াছেন, তোমরা ভুল করিয়া একে কমেডি বলিতেছ। 'ভিনিসের বণিকে'র মত ট্র্যাজেডি কম আছে, তবু লোকে বলে কিনা—বইখানা কমেডি।

এবারে সত্যকার কমেডি কাকে বলে দেখা যাক। অ্যারিস্টফেনিসের সঙ্গে গ্রীক্ মহানাট্যকারত্রয়ের কালের দূরত্ব বেশি নয়; কিন্তু ইতিমধ্যে একটা যুগান্ত ঘটিয়া গিয়াছে, সময়ের ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তে ঘটনার গুরুত্ব এই যুগান্তরের জন্য দায়ী। নাট্যকারত্রয়ের সময় ছিল কাজের সময়; পার্থিব লোকে পারসিক জাতিকে পরাজিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা; অধ্যাত্ম-লোকে সক্রেটিসের তত্ত্ব-প্রচারের দ্বারা আত্মস্থতা।

অ্যারিস্টফেনিস পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমালোচক, তিনি সক্রেটিস হইতে আরম্ভ করিয়া সে যুগের আইন-ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন, এবং কল্পনার মেঘলোকবিলাসী কাউকে রেয়াৎ করেন নাই। এই সমালোচনার ধারা নাট্যকারত্রয়ের কনিষ্ঠ ইউরিপিডিসের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাই তিনি ছিলেন তখনকার সনাতনীপন্থীদের মধ্যে একঘরে, আবার সেইজন্যই পরবর্ত্তী যুগের রসিকদের কাছে তাঁর মূল্য সেই পরিমাণে বেশি, গ্যেটে ইউরিপিডিসকে তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

অ্যারিস্টফেনিসের কমেডি যথার্থত criticism of life—যে জীবনকে পূর্ব্বের তিন জন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তার সমালোচনা, তার বিশ্লেষণ।

মলিয়েরর সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, আরও বেশি করিয়া খাটে; কর্নেই ও রাসিনের সঙ্গে সময়ের দূরত্বের তর্ক তুলিলে চলিবে না; মানুষের মনের ঘড়ির কোন স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম নাই।

ফরাসী কমেডি শিল্পের ধারাকে বহন করিয়া সিংহাসনে চার্লসের পুনরারোহণের সময়ে ইংলণ্ডে নূতন নাট্য রচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আকৃতির দিক দিয়া সে সব নাটক শেক্সপীয়রের কমেডিকে অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির বিচারে শেক্সপীয়রের কমেডির সঙ্গে তার কোন যোগ নাই, সমস্তই বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মূলক।

বর্ত্তমান জগৎ ও যুগ প্রধানত সমালোচনার সময়; নাস্তিক্য এখনকার প্রধান ধর্ম্ম; বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া আমরা বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে মলিকিউল, অ্যাটম, ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিয়োট্রনের গ্রান্থ পার হইতে হইতে চলিয়াছি, কোথায় তার শেষ জানি না। জানিবার ইচ্ছাও নাই, কারণ বিশ্লেষণ করাই এখন মানুষের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানুষের স্বভাবকেও আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা ভাবে বিশ্লেষণ করিতে করিতে চলিয়াছি; এ যুগে একজন অ্যারিস্টফেনিস বা মলিয়ের নয়; প্রত্যেকে আমরা অ্যারিস্টফেনিস, মলিয়ের, অবশ্য তাঁদের প্রতিভার অংশ বাদ দিয়া।

এ যুগ কমেডি-শিল্পের যুগ; যুগধর্ম্ম এত প্রবল যে, নাট্যকলাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কমেডি-শিল্প উপন্যাস-কাব্য-গল্পের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগ যে উচ্চদরের নাটক রচনা করিতে

সমর্থ হয় নাই, তার কারণ লেখকরা যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিল না; হয়তো যুগধর্ম্মও তখন তেমন প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই; ঊনবিংশ শতকের শেষে একজন যুবক এই যুগধর্ম্মের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং কালক্রমে এই চুলচেরা যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইয়াছেন; আর তিনি যে শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তা নয়, চুলচেরা তার্কিকও বটে; সেইজন্য তাঁর নাটকের সাধারণ নাম—তর্কনাট্য; আর নাট্যকারের নাম—জর্জ বার্নার্ড শ।

অ্যারিষ্টফেনিস, মলিয়ের, বার্নার্ড শ ও প্রথম বিশী

আমাদের (পাঠক, এক সঙ্গে চারটি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ! কি করিব, তোমরা একসঙ্গে এই নামগুলি যদি আগে উচ্চারণ করিতে, তবে আমাকে আর উচ্চারণ করিয়া তোমাদিগকে অধোবদন করিতে হইত না।) নাটকের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, সেগুলি না জানা থাকিলে আমাদের নাটক বুঝিতে অসুবিধা হইবে। (জানিলেও যে খুব সুবিধা হইবে, তা মনে হয় না।)

(ক) সাধারণ নাটকে আইডিয়া ঘটনাকে অনুসরণ করে; ঘটনা সেখানে প্রধান, আইডিয়া অনুগামী। আমাদের নাটকে আইডিয়াকে অনুসরণ করে ঘটনা; এ জাতীয় নাটক আইডিয়া-প্রধান, ঘটনা অনুগামী মাত্র। কাজেই এর আদ্যন্তব্যাপী শৃঙ্খলাকে ঘটনার মধ্যে অনুসরণ করিলে চলিবে না, আইডিয়ার মধ্যে করিতে হইবে; আইডিয়ার শৃঙ্খলাই এর মেরুদণ্ড।

(খ) কমেডি শিল্পের প্রাণরস বাক্যে, ঘটনায় নয়; কাজেই ঘটনার উপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করি নাই, পাঠকের কাছেও সে আশা করি না। বাক্‌চাতুর্য্যেই এর প্রাণ, নাটকের রস যথার্থভাবে পাইতে হইলে

বাক্যের মধ্যে তার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ট্র্যাজেডিতে ঠিক এর বিপরীত।

(গ) এ নাটক পড়িলেই মনে হইবে, কোন কোন চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের সহানুভূতি উগ্রভাবে স্পষ্ট; থিওরি পড়া পাঠক ভাবিতে পারে যে, নাট্যকারের শিল্পীজনোচিত নিরপেক্ষতার অভাব। সে অভাবের অভিযোগ আমি স্বীকার করিতেছি। বক্তব্য ও মতামত প্রচার করিবার জন্য আমি নাটক লিখি, কাজেই কোন কোন চরিত্রকে আমার ব্যক্তিগত ভাবনার মুখপাত্র করিয়া লইতে হয়, সেইজন্যই তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি। বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য; অ্যারিস্টফেনিসও কোরাসের সাহায্যে নিজের মতামত দর্শককে জানাইয়া দিয়াছেন।

(ঘ) এই কমেডির সঙ্গে মাঝে মাঝে ফার্সের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শেক্সপীরীয় নাটকে ট্রাজেডি ও কমেডিতে মিশ্রণ আছে, কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষের জীবনের সুর এত নামিয়া পড়িয়াছে যে, ট্র্যাজেডি মোটেই সম্ভব নয়; অনাবিল কমেডিও অসম্ভব; তার সঙ্গে পদে পদে ফার্সের মিশ্রণ ঘটিতেছে। এ যদি দোষের হয়, সে দোষ মূলত আমার নয়, যে যুগের জীবনযাত্রাকে আমি চিত্রিত করিতেছি, সেই যুগের—সেই যুগের বাঙালীর।

(ঙ) কমেডি-শিল্পের প্রাণ হৃদয়াবেগ নয়, ধীশক্তি; হৃদয় এখানে মস্তিষ্কের অনুসারী; কাজেই এ জাতীয় রচনাকে কোন কোন পাঠকের নীরস লাগিতে পারে; কিন্তু কোথায় রসের সঞ্চয় জানা থাকিলে সে ভয় নাই; মনে রাখিতে হইবে, হৃদয়াবেগই রসের একমাত্র উৎস নয়; ধী-রসও রস, এবং তা হৃদয়াবেগের চেয়ে নীরস নয়।

নাট্যবস্তু

ডিমস-হীন ডিমক্রেসি

নাটকটির উপরার্দ্ধে (ক, খ, গ অংশে) দেখানো হইয়াছে, গোপালদেব নির্ব্বাচিত জননায়ক (তখনকার দিনে প্রেসিডেণ্ট না বলিয়া রাজা বলিত) হইয়া বাংলা দেশকে মাৎস্যন্যায় হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

নাটকটির নিম্নার্দ্ধে (চ, ছ, জ অংশে) দেখানো হইয়াছে, বিংশ শতকের নির্ব্বাচন একান্তভাবে ব্যর্থ হইল। এর কারণ কি, এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

বাহিরের আড়ম্বরের দিক দিয়া, ডিমক্রেসির ঠাটের বিচারে বিংশ শতকের নির্ব্বাচন যথার্থতর, তবু এই যাথার্থ্য দেশরক্ষার উপযুক্ত নয়; বাংলা দেশের বর্ত্তমান মাৎস্যন্যায় দুর করিবার শক্তি এর নাই। কেন?

আসল কথা, ডিমক্রেসির মধ্যে ডিমস বা তেমন তেমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন, যার অস্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাচনী প্রথা দাঁড়াইতে পারিবে; অষ্টম শতকে বাংলা দেশে তেমন একজন শক্তিমান ব্যক্তির উদয় হইয়াছিল, বিংশ শতকে আজিও তার উদয় হয় নাই।

তখনকার দিনের নির্ব্বাচন-ব্যাপারের মূলে ছিল, কয়েকজন সামন্ত রাজা বা ধনী; গণনির্ব্বাচন যে হয় নাই, তা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। পণ্ডিতেরা 'প্রকৃতিপুঞ্জ' শব্দের যে ব্যাখ্যাই করুক না কেন, 'প্রকৃতিপুঞ্জ' অর্থাৎ সাধারণ লোক এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল; কিন্তু পরে তারা যখন দেখিল যে, গোপালদেব দেশব্যাপী অরাজকতার বিরুদ্ধে একমাত্র ভরসা, তারা কায়মনোবাক্যে তাকে সমর্থন করিয়াছিল।

'প্রকৃতপুঞ্জ' যে সাধারণ লোক নয়, তার কারণ আমাদের দেশের ইতিহাসে সাধারণ লোককে রাষ্ট্রীয় যজ্ঞশালার ভিতর-মহলে কখনও

ডাক দেওয়া হয় নাই; সেখানে অসাধারণ কয়েকজন মিলিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছে; সাধারণের জন্য বাহিরের প্রাঙ্গণে পাত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এই পাত পড়িবার কখন ব্যতিক্রম হয় নাই; হিন্দু, পাঠান, মুসলমান কোন আমলেই এই পাতে অন্নের অসদ্ভাব ছিল না। ইংরেজদের আমলে এই অন্নে টান পড়িয়াছে; তারা যে কেবল যজ্ঞ-শালার মালিক হইয়াছে তা নয়, সাধারণের অন্নেও ভাগ বসাইতে চেষ্টা করিয়াছে, ফলে সাধারণের চোখ একটু ফুটিয়াছে, কিন্তু যতটা প্রয়োজন তত খুলিয়াছে কি?

কাজেই রাষ্ট্রীয় যজ্ঞ-ব্যাপারের এখন অংশীদার দুই শ্রেণীর—দেশীয় লোক ও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়। কিন্তু বাহিরে যারা পাত পাড়িয়াছে, তাদের সংখ্যা ভিতরের অংশীদারদের চেয়ে অনেক বেশি; তারা যদি বাঁকিয়া বসে, তবে যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইতে কতক্ষণ! সেইজন্য তাদের মন ভুলাইবার জন্য, মাঝে মাঝে ভিতরের মহলে তাদের ডাক পড়ে; তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়, তোমরাও এর মালিক, কিম্বা তোমরাই মালিক, আমরা কেবল দীন কার্য্যকারক মাত্র। তারা বোঝে, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত না বুঝিয়া গোলমাল বাধাইবার লক্ষণ দেখায় নাই। এই প্রতারণারই ইউরোপীয় নাম ডিমক্রেসি।

কিন্তু আসলে ইহা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। শূন্যেও যে উদ্যান রচনা করা যায়, তার কারণ যে চাতালটার উপরে গাছ পোঁতা হইয়াছিল, তার নীচে ছিল পাথরের স্তম্ভ, কাজেই শূন্যোদ্যান একেবারে শূন্যে ছিল না। ডিমক্রেসির শূন্যোদ্যানের নীচে পাথরের অটল স্তম্ভ আবশ্যক, গোপালদেব ছিল সেই পাথরের কঠিন স্তম্ভ। তবে তার সঙ্গে বর্ত্তমান শূন্যোদ্যানের প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তখনকার উদ্যান ছিল শূন্যে, আর এখনকার উদ্যান শূন্য, গাছপালা কিছুই নাই,

তবু বলিতেছি, উত্থান। জনগণের এ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রবেশের পথ নাই, তবু বলিতেছি, এই তো গণতন্ত্র। আসলে এটা কতকগুলি ধনিক ও বণিকের, যাদের মুখে সাধারণের মুখোস, যাদের মুখে ইতর ভাষা (ইতরের ভাষা নয়), যাদের পকেটে অপরের টাকা (নিজের টাকা নয়), এমন কতকগুলি ধনিক ও বণিকের লোক ঠকাইবার যন্ত্র মাত্র।

কেন এমন হইল ?

ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার প্রচলনে, সংবাদপত্রের প্রসারে, যাতায়াতের দ্রুতিতে, সকলেই আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, ভাবিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভাবিবার চেষ্টা সহজ হইতে পারে, ভাবিবার শক্তি সহজ নয়, নিতান্ত দুর্লভ; লক্ষ জনের মধ্যেও একজন চিন্তা করিতে পারে কিনা সন্দেহ।

এ তথ্যটা ধনিক ও বণিক সম্প্রদায় অবগত আছে; তারা নিজেদের চিন্তাকে সাধারণের চিন্তা বলিয়া প্রচার করিতেছে; নিজেদের স্বার্থের পথকে সাধারণের সত্যের পথ বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিতেছে; আর মূর্খ জনসাধারণ সে চিন্তা ও পথকে অবলম্বন করিয়া যুগপৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে ও প্রতারিত হইতেছে। ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের মূলে সাধারণের এই বুদ্ধি-বিভ্রাট।

এই দেশব্যাপী বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের যুগে এমন একজন বিরাট ব্যক্তির আবশ্যক, যে নিজের বিশাল চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে সাধারণের ক্ষুদ্র, বিপরীতমুখী, লক্ষ্যবিহীন, চিন্তার অববাহিকাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া সকলের মঙ্গলমুখী সমুদ্র-মোহানার দিকে নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, যে একাকী একটা বিরাট দেশের জন্য ভাবিতে পারিবে; তেমন লোক মেলা সহজ নয়, কিন্তু দেশের মঙ্গল সাধন করাও যে কঠিন কাজ।

সেইজন্যই ডিক্টেটরশিপের আবশ্যক

এ যুগের আদর্শ শাসক ডিক্টেটর। ডিক্টেটরের বাংলা প্রতি-শব্দ নাই, কারণ বাঙালীর কল্পনাতে আজও ডিক্টেটরের উদয় হয় নাই, বাস্তবে তো দূরের কথা। (স্বৈর-শাসক কথাটা কি চলিতে পারে না?) স্বৈর-শাসনই এ যুগের রাজনৈতিক ধর্ম্ম।

মানুষের ইতিহাসে বহুকাল রাজতন্ত্রের পরীক্ষা চলিয়াছে, গণতন্ত্রের পরীক্ষাও নানা দেশে বহুকাল হইল হইয়া আসিতেছে, এবার ডিক্টেটর-শিপের পালা। রাজতন্ত্র থেসিস, গণতন্ত্র তার এন্টিথেসিস; আর ডিক্টেটরশিপ এতদুভয়ের মাঝে সিন্‌থেসিস বা সমন্বয়।

অবশ্য এ কথাও জানি যে, এই ডিক্টেটরশিপ কিছুকাল চলিলে আবার নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে এবং নূতন করিয়া সমন্বয়সাধনের জন্য মানুষের ডাক পড়িবে। কিন্তু পলিটিক্সে মানুষ আজকার দিনের কথাই ভাবে, আগামীকল্যের ভাবনা সে তাত্ত্বিকদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত।

এই ডিক্টেটর শৃঙ্খলার লোহার ফ্রেমে দেশব্যাপী অরাজকতাকে (চিন্তার ও কর্ম্মের) সংবদ্ধ করিবে; ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে (অনেক সময়ে যা উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র) সমষ্টির সুখ-সুবিধার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবে; এক কথায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির যুগযুগব্যাপী সমস্যার সমাধান করিবে। দেশের বাহ্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করিবে। কারণ—

স্বাধীনতা দুই রকমের—

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ। বিষয়টাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের বাহ্য স্বাধীনতা নাই, আমরা ইংরেজের

অধীন; আবার ইটালি বা জার্মানির বাহ্য স্বাধীনতা আছে, তারা অন্য কোন রাষ্ট্রশক্তির অধীন নয়।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ইটালি ও জার্মানির চেয়ে বেশি; তারা প্রতিনিয়ত ডিক্টেটরের যে লৌহমুষ্টি অনুভব করিতেছে, আমরা তেমন করিতেছি না। কেবল রাজনৈতিক স্বার্থের বেলায় এ দেশের বিদেশী গভর্মেণ্ট অত্যন্ত সচেতন; আর কোন দিকে তাদের দৃষ্টি নাই, কারণ স্বার্থ নাই।

আমরা কলিকাতার পথে চলিতে চলিতে কাগজ ফেলিয়া, আবর্জ্জনা ফেলিয়া যথেচ্ছ নোংরা করিতে পারি; গভীর রাত্রিতে সঙ্গীতচর্চ্চার নামে কোলাহল করিয়া নিরীহ প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারি; রেডিও-যন্ত্রে লাউড স্পীকার বসাইয়া অনিচ্ছুক প্রতিবেশীর প্রতি আবশ্যিক সাঙ্গীতিক দণ্ডবিধান করিতে পারি। এমন কত দৃষ্টান্ত দিব!

জার্মানির রাজপথে কাগজের টুকরা ফেলা দণ্ডনীয়। সহস্রচক্ষু ডিক্টেটরের পাঁচশো চোখ যদি পররাষ্ট্রবিষয়ে নিবদ্ধ, অন্তত আর পাঁচশো এই সব আভ্যন্তরীন খুঁটিনাটি জীবন-ব্যাপারের প্রতি নিবদ্ধ।

যে যুগের মোড়ে আমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখন অসঙ্কোচে বলা যায় যে, বাহ্য স্বাধীনতা হইতে এক জাতি অন্য জাতিকে বেশি কাল আর বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। চীন ও আবিসিনিয়ার ঘটনা বিকারগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম আস্ফালন, রোগী মরিবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগও শেষ হইবে; এমন কি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যাকেও কমিশন-কমীটি-কম্যুনাল-অ্যাওয়ার্ডের বেলেস্তারা লাগাইয়া বেশিকাল আর টিঁকাইয়া রাখা যাইবে না। বাহ্য স্বাধীনতার সমস্যা একরকম সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে; আমার মতে এ সমস্যা

আর সমস্যাই নয়, কারণ এ তর্কের মধ্যে আর চুলচেরা বিচারের অবকাশ নাই।

এ যুগের আসল সমস্যা আভ্যন্তরীণ সমস্যা। ব্যক্তি কতখানি পরিমাণে সমষ্টির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে? কতখানি পরিমাণে আত্মবিসর্জ্জন করিলেও ব্যক্তির বক্তিত্ব নষ্ট হয় না; কতদূর পর্য্যন্ত সে নিজের, এবং তার কতখানির উপরে অপরের দাবি—এই সমস্যার সমাধানই করিতে হইবে বর্ত্তমান যুগকে।

বিষয়টি যে নূতন, তা নয়; গ্রীক তাত্ত্বিকদের সময় হইতে তত্ত্ব-আকারে বিষয়টি মানুষের সম্মুখে রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু এর বাস্তব পরীক্ষা মানুষের সমাজে কেহ করে করে নাই।

আধুনিক যুগের ডিক্টেটরগণ এ পরীক্ষায় নূতন ব্রতী; মুসোলিনি হিট্‌লার হয়তো ব্যাপারটি লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছেন, নানা রকম ভুলভ্রান্তি করিতেছেন, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তাঁরা এ পথের প্রথম পথিক; প্রথম পথিকের ভুলভ্রান্তির দ্বারা তাঁদের কার্য্যকলাপ ভারাক্রান্ত; কিন্তু আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, সাহস করিয়া কেহ পরীক্ষায় না নামিলে সমস্যার সমাধান হইবে কেমন করিয়া?

আমাদের দেশের সমাজতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ের গডিয়ান-গ্রন্থি ছেদন করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছিল। তারা মানুষকে মনে অপরিমিত স্বাধীনতা দিয়া সমাজের মধ্যে অমোঘ কর্ত্তব্য-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। তারা জানিত, মানুষ যে সামাজিক জীব, এ বাণী সত্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র; অপরার্দ্ধ হইতেছে, মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। সেইজন্য বিশ্বাসে আমাদের কোন বাধা নাই; তবে সামাজিক কর্ত্তব্য, যার মানে অন্যকে স্বীকার করিবার ভাব, সেটা পালন করিয়া চলা চাই।

কিন্তু এ সমাধানের জলাশয় আজ বহুদিনের অপব্যবহারে ও

পঙ্কোদ্ধারের অভাবে পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে ; নূতন করিয়া একে খনন করিতে হইবে, গভীর করিতে হইবে, নূতন ভাব-প্রবাহের ধারা আনিয়া এর জলকে পবিত্রতর ও পেয়তর করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের দূরদৃষ্টি যতই থাক, সর্ব্বকালের সমস্যার সমাধান করিয়া যাইবার মত দৃষ্টি কারও নাই।

গ্রীকদের দৃষ্টি সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টির উপরেই ছিল বেশি ; ব্যক্তির প্রতি তাদের যে সহানুভূতি ছিল, সঙ্ঘের প্রতি তেমন নয় ; ব্যক্তিত্ব-বিকাশকেই তারা মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করিত ; সেইজন্য গ্রীক-ইতিহাস জাতির ইতিহাস নয়, কয়েকজন উগ্র ব্যক্তিত্বশালী মহাপুরুষের ইতিহাস।

প্রথমে রোমানদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে ; তারা বুঝিতে পারিয়াছিল, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেমন কেউ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, তেমনই তার বিকাশের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন নাই ; সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ; সেইজন্যই রোমক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি তার আইনের মধ্যে প্রকাশিত ; আইন সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার রাষ্ট্রীয় পন্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

জুলিয়াস সীজারের লোকাতীত প্রতিভা এই ধর্ম্মটিকে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রোম নগর আর একটি স্বতন্ত্র নগর মাত্র নয়, বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন এবং দূরনিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড ; সেইজন্য তিনি রোম নগরের পৌর অধিকারকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া আল্পসের উভয় পারবর্ত্তী গল জাতিকে তাঁর গণ্ডির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগসাধন ছিল তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এ সমস্যার রূপকে তখনকার কালের আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝিতে পারেন নাই, এমন কি সিসেরো ও নয়।

কিন্তু সমষ্টির প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, যাকে আমরা বলি ইউরোপের মধ্যযুগ। এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক ধর্ম্মের অনুশাসনে ইউরোপ একীভবনের দিকে চলিতেছিল; ব্যক্তিত্বের বিকাশকে তখন ব্যক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, মধ্যযুগেই প্রকৃত সোশ্যালিজ্‌ম ছিল। হঠাৎ ইতিহাসের একটা আকস্মিক ঘটনার ফলে লুপ্ত গ্রীক সভ্যতার পুনরুদয় ঘটিল; মধ্যযুগের অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ আদর্শে ফাটল দেখা দিল; যত লোকে গ্রীক শিখিল, তার চেয়ে অনেক বেশি লোকে লাটিন ভুলিল; ব্যক্তিত্ব-চর্চ্চাকেই মনুষ্যত্ব মনে করিয়া লোকে সমষ্টি হইতে ভারকেন্দ্রকে সরাইয়া আনিল; ইউরোপের ভাষার ঐক্য দূর হইয়া গেল।

তার পরে আসিল রিফর্মেশন। ইউরোপের, তথা মানুষের ইতিহাসে, সেটা আর একটা দুর্ভাগ্যকর ঘটনা; ইউরোপের ধর্ম্মের ঐক্য দূর হইল।

রেনেসাঁসের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের ঐক্য ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, রিফর্মেশনের পরে ধর্ম্মবন্ধনের ছেদে মানুষ অস্বাভাবিকভাবে আত্ম-সচেতন হইয়া রাষ্ট্রভেদের বনিয়াদ পাকা করিতে লাগিল। ইউরোপ সব দিক দিয়া মধ্যযুগের শিক্ষাকে অস্বীকার করিয়া সমষ্টিকে বিসর্জ্জন দিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

মধ্যযুগের বাণীর পুনরাবর্ত্তন

আধুনিক যুগের ফ্যাসিজ্‌ম ও সোশ্যালিজ্‌ম এক হিসাবে তত্ত্বের বিচারে অভিন্ন; উভয়েরই উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অর্জ্জন ও তাকে খর্ব্বীকরণ। ইটালীর আবিসিনিয়া জয়কে এর বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত বলা চলে না; অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ এ যুগের লক্ষণ নয়, বিগত যুগের সাম্রাজ্যবাদের উদ্গার।

ফাসিস্ত ও সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ; তত্ত্বের বিচারে সকলেই স্বীকার করি যে, ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক; কিন্তু এই সমন্বয়ের যথার্থ অনুপাতটি এখনও ধরা পড়ে নাই; একদিকে উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ, অন্যদিকে উগ্র সমষ্টিবাদ, কিছুতেই দুই বিষম পদার্থের মধ্যে সাম্য ঘটিতেছে না।

মধ্যযুগের অভিজ্ঞতা যে আজ বিশেষভাবে কাজে লাগিবে, তা মনে হয় না, বাহ্য অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাজেই নানা দুঃখকষ্ট ভুলভ্রান্তির এক্স্‌পেরিমেণ্ট দ্বারা এ যুগের মানুষকেই সেই রাসায়নিক অনুপাতটি আবিষ্কার করিতে হইবে; এই এক্স্‌পেরিমেণ্টের বিস্ফোরণে অনেক পরীক্ষক মরিবে, অনেক পরীক্ষাগার উড়িবে, অনেক কামান অনল বর্ষিবে, অনেক উড়োজাহাজ বোমা নিক্ষেপিবে, অনেক রাজ্য ও রাজসিংহাসন ধসিবে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! পাহাড়ী অঞ্চলে রেল-লাইন পাতিতে গেলে ডিনামাইট দিয়া অনেক পাহাড় উড়াইয়া দিতে হয়, মানুষের ইতিহাসের অগ্রগতির পথে যুদ্ধবিগ্রহ সেইরূপ ধ্বংস-কার্য্য, যাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অদৃশ্য বাধার পাহাড়-পর্ব্বত উড়িয়া যাইতেছে। রেল-লাইন পাতিতে গেলে ডিনামাইট ব্যবহার করিতে হইবে; অগ্রসর হইতে চাও তো কামান বন্দুক ব্যবহার করিতে হইবে, প্রেমের দ্বারা পাথর সরানো যায় না।

নবযুগের পুরাতন বাধা

নবযুগে আমি বিশ্বাস করি না; করিব কেন? পুরাতন যুগের সমস্যার সমাধান কি হইয়াছে? তা যদি না হয়, তবে নবযুগে বিশ্বাস মানে পুরাতন যুগে অবিশ্বাস।

যে নবযুগের বড়াই সর্ব্বদা আমরা করি, তার সবচেয়ে বড় বাধা পুরাতন যুগের একটা অমীমাংসিত সমস্যা। কি ভাবে নির্ব্বাচন করা হইবে? ইংলণ্ডে ১৮৩২ সালে ভোটবিস্তারে প্রাচীন ধনীসম্প্রদায় প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা বুঝিতে পারিল, ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নাই। শিক্ষিত ধনী স্বল্পসংখ্যক লোকের ভোট অপেক্ষা অশিক্ষিত দরিদ্র বহুসংখ্যক লোকের ভোট নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ, অনেক সুলভ, আর তার সঙ্গে যদি পাকা বাঁশের লাঠি থাকে, তবে তো কোন চিন্তাই নাই। ডিমক্রেসি অতি উত্তম, তবে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ও বারুদ থাকা আবশ্যক।

দেশব্যাপী গণভোট নিয়ন্ত্রণের মত সহজ ব্যাপার আর নাই; এর মধ্যেও সেই মুষ্টিমেয়ের লীলা। এই রাজকীয় প্রহসনের দলিলখানা লেখে সামান্য কয়েকজনে, কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণ না বুঝিয়া তাতে মোটা অক্ষরে, অনেক সময়েই রক্তাক্ষরে, স্বাক্ষর করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে।

কিছুদিন আগে অষ্ট্রিয়া এই রকম গণভোটের খাল কাটিয়া জার্মানির কুম্ভীরকে আহ্বান করিয়াছিল, আবার কিছুদিনের মধ্যেই সুদেতেনের রোহিতমৎস্য গণভোটের বেড়াজালে জার্মানির ভাগ্যে উঠিবে; হিটলার একা টানিয়া তুলিতে না পারিলে সাহায্যের অভাব হইবে না—চেম্বারলেন আছেন।

যতদিন এই ভাবে গণভোট লইবার ব্যবস্থা থাকিবে, ততদিন এই ভাবেই জনগণ প্রতারিত ও গণতন্ত্র বিড়ম্বিত হইতে থাকিবে। তবে এর প্রতিকার কি? বার্নার্ড শ অনেক দিন আগে একটা প্রতিকারের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ও আমার কথা শুনিবার মত মানসিক অবস্থা লোকের এখন নয়।

মণিময় ভোটে হারিল কেন ?

মণিময়ের হারিবার কথা নয়, সে লোকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই নির্ব্বাচনে নামিয়াছিল, লাঙল ছিল তার প্রতীক। অবশ্য আমরা পাঠকেরা তার মনোভাব জানি, লোকেরা কিছুই জানিত না; সে নির্ব্বাচিত হইলে নির্ব্বাচনী প্রতিজ্ঞার একটি কথাও রক্ষা করিত না। কেই বা করে? আর কেনই বা লোকে তা আশা করে? নির্ব্বাচনী প্রতিজ্ঞা আর প্রাক্‌বিবাহ অঙ্গীকার সমগোত্র, আশ্বাস দিবার জন্য, বিশ্বাস করিবার জন্য নয়।

মণিময় সাধারণ ক্ষেত্রে নিশ্চয় জিতিত, কিন্তু তার চেয়েও একজন চতুর লোকের এমন সময়ে উদ্ভব হইল—শ্রীমন্ত চাটুজ্জে।

সে ইউরোপ ঘুরিয়া, এবং তার কথায় বিশ্বাস করিলে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে শিক্ষানবিশী করিয়া, নির্ব্বাচন রহস্য শিখিয়া আসিয়াছিল। সে জানিত, সাধারণ লোক নাবালক; তারা কাজের কথায় ভয় পায়, খেলার কথায় তাদের আনন্দ; পেটের দায়ে লাঙল চালায় বটে, কিন্তু একটু আশ্বাস পাইলেই চাষের মাঠ হইতে খেলার মাঠে আসিতে পারে; এমন কি, চাষের মাঠকেই খেলার মাঠে পরিণত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এহেন সাধারণ লোকের মধ্যে শ্রীমন্ত ফুটবলের অভয় অশোক বাণী লইয়া উপস্থিত হইল। তারা যুগপৎ শ্রীমন্ত ও ফুটবলকে লুফিয়া লইল। মহাভারতের কালেও হলধর বলরামের চেয়ে বংশীধর কৃষ্ণ অনেক বেশি পপুলার ছিলেন। আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও নির্ব্বাচনের সময়ে লাঙল ভরসা করিয়া নামিয়াছিলেন, নির্ব্বাচনের পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে ফুটবল খেলোয়াড় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আরও পপুলারিটির প্রয়োজন হইলে এর পরে যে তিনি নিজেকে ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে সিনেমা-স্টার বলিবেন না, তা কে বলিতে পারে!

একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স

শ্রীমন্ত চাটুজ্জে ইউরোপ হইতে অসিবার সময় একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স আনিয়াছিল, বক্তৃতার দরকার হইলেই সেই বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিত; ওটার উপরে না উঠিলে নাকি তার কথা জোগায় না। সে বলে, ওটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের দান। আমার বিশ্বাস, অতটা সত্য নয়, বাক্সটা এ দেশেই যোগাড় করা।

কিন্তু তার কথায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে ভাবিবার খোরাক পাওয়া যায়।

মানুষের বিপদ এই যে, সে ভাবিবার বেলা এক রকম ভাবে, করিবার বেলা আর এক রকম করে; চিন্তার মহত্ব খানিকটা সে লাভ করিয়াছে, কিন্তু তা কাজে অনুবাদ করিবার সামর্থ তার নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কল্পনা মহৎ, যদিও নূতন নয়, কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া এই মহত্ব মানুষ মারিবার নূতন কলে পরিণত হইল।

প্রাক্‌রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুগে অন্তত ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল; তারা জানিত, তাদের লইয়া টানাটানি সুরু করিলে মহারথীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এখন আর সে ভরসা নাই; ছোটখাট রাষ্ট্র বিপন্ন হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ণধারেরা, সে বিপদ ইউরোপীয় সমস্যা না হইয়া উঠে, সে দিকে দৃষ্টি রাখে, ততক্ষণে হতভাগ্য ছোট রাষ্ট্রের দফা শেষ হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ছদ্মশত্রু। যুদ্ধভীতিকে এক দিকে কমাইয়া দিয়া অন্য দিকে বাড়াইয়া দিয়াছে; সে যেন বলিতেছে, localised যুদ্ধ যত পার কর; এমন যুদ্ধ বাধাইও না, যাতে সবাই জড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। বড় যুদ্ধে বাণিজ্যের ক্ষতি, কাজেই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এমনভাবে চালিত করা হয়, যাতে যুদ্ধের কাজ হয়, অথচ বাণিজ্যেরও ক্ষতি না হয়; ওর মধ্যে বাণিজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সন্ধিস্থাপন করিয়াছে।

এখন যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে, এ বিষয়ে অনেক বক্তৃতাও শোনা যায় ; কিন্তু এর চেয়ে বড় আন্দোলন ও তীব্রতর ভাষা দরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহুত সভা বন্ধ করিবার জন্য ; কমীটি-কমিশন-ইণ্টারভেন্‌শন-প্যাক্ট মানুষের যত গুপ্ত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কোন যুদ্ধে এমন করে নাই ; যুদ্ধের শত্রু চেনা যায়—প্রত্যক্ষ ; সভার শত্রু অর্থাৎ সভ্যশত্রু চেনা কঠিন।

ইটালি-আবিসিনিয়ার, ফ্রাঙ্কো-স্পেনের, চীন-জাপানের যুদ্ধ—সব কটা সর্ব্বনাশের মূলেই এমন এক একটি কমীটি। জার্মানির অষ্ট্রিয়া-গ্রাস এত সহজে ও শীঘ্র হইয়াছে যে, কমীটি বসাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সুদেতেনের বেলায় হিট্‌লার চতুঃশক্তি সম্মিলন দাবী করিয়াছেন। তদা নাশংসে বিজয়ায়।

ইউরোপের ছোটখাটো রাষ্ট্রগুলির এখন বাঁচিবার একমাত্র উপায়, সকলে মিলিয়া বাহিনী সাজাইয়া জেনেভার বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলা। ভয়ের কারণ নাই ; যে ইউরোপ আজ স্বার্থহানি ঘটিলেও চোখ ঠারিয়া যায়, জাপানী পুলিসের কিল জন-বুলের উদ্ধত নাসিকাকে গতিগর্ব্বী বিন্ধ্যের মত খর্ব্ব করিয়া দেয়, জাপানী সৈন্য চড় মারিলে তাকে প্রীতি-সম্ভাষণ বলা হয়, সে ইউরোপ একটা বাবুইয়ের বাসা ভাঙিলে যুদ্ধ নিশ্চয় করিবে না, বড় জোর দু চার জন প্রধানমন্ত্রী ঘটনার গুরুত্ব দেখাইবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে এরোপ্লেনে করিয়া যাতায়াত করিবে, একটি শক্তি-সম্মিলন বসিবে। ততদিনে রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও কাজ শেষ হইবে। সভা শেষ করিয়া তারা দেখিবে, বাঁচাইবার মত আর কিছু নাই ; তখন realityকে স্বীকার করিয়া তারা ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

বাংলা দেশের ম্যাপ গুটাও

এই নাটকে প্রধানত বাঙালীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। পিট অস্টারলিজের সংবাদ শুনিয়া দশ বছরের জন্য ইংলণ্ডের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিতে বলিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরাইয়া শুইয়াছিলেন।

বাংলা দেশের মানচিত্র যে কত বছরের জন্য গুটাইয়া রাখিতে হইবে জানি না; যদি চিরদিনের জন্য না হয়, অন্তত খুব দীর্ঘকালের জন্য।

আজ পৃথিবীতে ইহুদিদের যে দশা—বিশেষত জার্মানি, ইটালি ও পালেস্টাইনে—অচিরকালের মধ্যে বাঙালীদেরও সেই দশা হইবে। ইহুদিদের জন্মস্থান যেমন ইহুদি-হীন, বাংলা দেশও তেমনই নির্বাঙালী হইবে; লোকে ইতিহাসে পড়িবে, এ দেশে একদিন বাঙালী ছিল।

আর বঙ্গের বাহিরে বাঙালী এখন সৌভাগ্যবান ও ঐশ্বর্য্যবান; সেদিন আর তেমন থাকিবে না; এই গৃহহীন, ভাষাহান, যাযাবর দরিদ্র জাতি ভিক্ষান্নগতপ্রাণ হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে, লোকে অনুকম্পাও করিবে না। ইহুদিদের বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধির বলে তারা বিদেশেও বড়; আর সেই বড়ত্বের জন্যই ঈর্ষিত; সেই ঈর্ষ্যাই তার প্রতি অত্যাচারের কারণ। বাঙালীর বুদ্ধি নাই (পরচর্চ্চা ও আত্মকলহের যে সহজাত স্বেচ্ছা তাকে বুদ্ধি বলে না), পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই; দেশ হইতে তাড়িত হইয়া বিদেশে যে অসাধারণত্ব লাভ করিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

যদি বল এমন যে ঘটিবে, তার প্রমাণ কি? আমি বলিব, তোমার ওই প্রশ্নই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। প্রলয় পয়োধির জল বাড়িতে বাড়িতে নাকের ডগায় ঠেকিলেও যারা প্রমাণ চায়, বিধাতাও তাদের রক্ষা করিতে পারেন না; না, বিধাতাই তাদের মারিয়া ফেলেন।

ডাক্তার ! ডাক্তার !

অনেকে অভিযোগ করে যে, আমার নাটকে ডাক্তারদের প্রতি অযথা অবিচার করা হইয়া থাকে, তাদের হাস্যকর করিয়া তোলাই যেন আমার উদ্দেশ্য।

ডাক্তারদের যে ব্যবহার, যদি তারা মানুষের রক্তে এবং রক্তাধিক অর্থে অতিরঞ্জিত না হইত, তবে তাদের হাস্যকর বলা যাইত; কিন্তু নিরীহ রোগীর রক্তে যাদের অস্ত্র সিক্ত, তাদের হাস্যকর বলিবে কে ?

ডাক্তারদের পক্ষে অসাধুতা করা খুব সহজ, কারণ পরভাষার বেড়া দেওয়া তাদের বিদ্যার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ সহজ নয়; এই দুরূহত্বের সুযোগে তারা ইচ্ছা করিলেই রোগীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে।

অধিকাংশ ডাক্তার চিকিৎসা ব্যাপারে পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী; কিন্তু ব্যবসায়িক সাধুতা বলিয়া যে একটা অদ্ভুত গুণের প্রাদুর্ভাব বর্ত্তমানকালে হইয়াছে, তাও এদের নাই। কোন ডাক্তারের কাছে রোগী গেলেই, যদি তার প্রয়োজন না-ও থাকে, একটা ঔষধ লিখিয়া দেয়; যদি একটা ঔষধের প্রয়োজন থাকে, দুটা তিনটা লিখিয়া দেয়।

রোগী যদি রোগভীরু হয়, অমনই তার ব্লাড, ইউরিন, স্পুটাম পরীক্ষার ধুম পড়িয়া যায়। ডাক্তার বলে, আপনার ব্লাডটা অমুক ডাক্তারকে, ইউরিনটা অমুক ডাক্তারকে, স্পুটামটা অমুক ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করাইবেন। কারণ তাদের মত সুপরীক্ষক নাকি সে আর জানে না। আসল কারণ, তারা তাকে প্রয়োজনমত কাজ যোগাড় করিয়া দেয়। রোগী যদি বলে, অমুক জায়গায় দেখালে চলে না ? একটু কমে হয় ! ডাক্তার অমনই গম্ভীরভাবে বলে, ওয়েল, ইউ টেক

দি রিস্ক। রোগী প্রাণভয়ে রাজি হয়। সে জানে না, যখন সে ডাক্তারের কাছে গিয়াছে, তখনই চরম রিস্ক লইয়াছে।

অনেকে বলিবে, কেন, ডাক্তারি-শাস্ত্রে কি কুইনাইন বা কালা-জ্বরের ঔষধ নাই, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ কি এসব ঔষধে বাঁচায় না?

আমার অভিযোগ ঔষধের বিরুদ্ধে নয়, ঔষধের যারা ব্যবসা করে, তাদের অমানুষিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। খুব গোড়ার একটা কথা তারা ভুলিয়া যায়, ডাক্তার হইলেও তারা মানুষ।

এই সব বৈজ্ঞানিক পানিপাঁড়ের দল রোগীকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া অধিকাংশ সময়ে কেবল রং-গোলা জলের ব্যবস্থা দিয়া তার ধন হরণ করে; আশানুযায়ী টাকা আদায় করিতে না পারিলে অনেক সময়ে প্রাণটাও ফাউ হিসাবে আদায় করিয়া লয়। আমরা বিজ্ঞানের নামে, প্রাণের ভয়ে এই বৈজ্ঞানিক বর্গীর উপদ্রব সহ্য করিতেছি।

ডাক্তারদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্মেণ্টের তৎপর হওয়া উচিত।

রোম নগর পুড়িবার সময়ে নীরো কি বীণা বাজাইতেছিলেন?

আগে বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু বাঙালী জাতির চরিত্র দেখিয়া ক্রমে এই অসম্ভব ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস জন্মিতেছে। দেখিতেছি, একটা সমগ্র জাতি হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে (প্রাচ্য নৃত্য), রেকর্ড ভঙ্গ করিতে করিতে (বিশেষভাবে জলে ভাসাতে; বাঙালী যে জলে পড়িয়াছে, এটা বোধ হয় তারই প্রতীক), খেলিতে খেলিতে এবং খেলা দেখিতে দেখিতে, ভবিষ্যতের অন্ধকার আকাশের

একমাত্র উজ্জ্বল তারকা সিনেমা-স্টারদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, রেডিও-বিলাসে নিজের ও প্রতিবেশীর কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে, দুঃস্বপ্নগ্রস্ত ধ্বংসমুখী ছিন্নমস্তা হইয়া মৃত্যুর পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; যখন দেখি, তখন বিশ্বাস না হইয়া যায় না যে, ঘরে আগুন লাগিলেও এমন অব্যস্ত থাকা যায়। বাঙালী, তুমি মূঢ়, মূর্খ, বাক্‌সর্ব্বস্ব, ক্ষীণপ্রাণ, ভণ্ডাচারী, ক্ষুদ্রচিত্ত; বাঙালী, তোমার প্রাণ প্রাণ নয়, বিকারের শেষ আস্ফালন; তোমার হৃদয় বহু যুগের সংস্কারে ও এ যুগের বেরিবেরিতে শিথিল; তোমার শিক্ষা কতকগুলি বাঁধা বুলির আবৃত্তি; তোমার রাজনীতি আত্ম-প্রচারেরও অধম, কারণ আজ তুমি আত্ম-প্রচারেও অক্ষম; তোমার উচ্চ শ্রেণী স্বার্থান্ধ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিন্নমস্তা, নিম্ন শ্রেণী উভয় শ্রেণীর বাক্যের কুয়াশায় উদ্‌ভ্রান্ত; তোমার সাহিত্য অর্দ্ধেক অনুকরণ, অর্দ্ধেক অনুরমণ; তোমার পাঠ্য ক্যাটালগ এবং তোমার মৃত্যুবাণ গদ্য-কবিতা; অভিধানের দুরূহতম শব্দের মুষল প্রসব করিয়া তোমার পণ্ডিতম্মন্য অভিধানোন্মত্ত সাহিত্যিক যদুবংশ আজ মৃত্যুকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিতে ব্যস্ত; তোমার রক্ষা নাই; বিধাতার ইচ্ছা নয়, তুমি বাঁচিয়া থাক; সুন্দরবনের অধিকার ক্রমে বিস্তীর্ণতর হইয়া এ দেশকে অধিকার করুক, সেই দেশব্যাপী অরণ্যে আমার এই অরণ্য-রোদন। / যদি এখনও প্রাণের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই ভরসায় তোমার মানসিক পৃষ্ঠে এই ভূমিকার পদাঘাত করিলাম। পার তো আত্মরক্ষা কর। বিধাতা যাকে মারে, তাকে রক্ষা করিবে কে?

প্র. না. বি.

অভিনেতাদের প্রতি

আবশ্যক হইলে নাটকটির ক খ গ ও চ ছ জ অংশকে দুটি স্বতন্ত্র নাট্যরূপে অভিনয় করা যাইতে পারে।

অভিনয় করিবার পূর্ব্বে পরিশিষ্ট পাঠ করা প্রয়োজন।

পাত্র-পাত্রী

ক, খ, গ অংশ

গোপালদেব	—	গৌড়ের নির্ব্বাচিত রাজা
রণসিংহ	—	দণ্ডভুক্তিরাজ
কমলবর্ম্মা	—	উদ্দণ্ডপুররাজ
মণিভদ্র	—	ঢেকুরের রাজা
জয়াপীড়	—	গোপালদেবের কোষাধ্যক্ষ
চক্রপাণি	—	,, মহাসামন্ত
কল্যাণবর্ম্মা	—	,, মহাসন্ধিবিগ্রহিক
নাগভট্ট	—	ধনী শ্রেষ্ঠী
ইন্দ্রদত্ত	—	সোনা রূপার ব্যবসায়ী
ঈশ্বর ঘোষ	—	অস্ত্রব্যবসায়ী
নকুড়	—	জয়াপীড়ের ভৃত্য

ক্ষপণক, ক্ষপণক-শিষ্যদ্বয়, নগরজ্যেষ্ঠগণ, সৈন্যগণ, প্রতিহারী, রাজভৃত্য ইত্যাদি

ভদ্রা	—	ধনীতম শ্রেষ্ঠীর কন্যা
বল্লভা	—	ভদ্রার পরিচারিকা

পুরবাসিনীগণ, চামরধারিণীদ্বয়, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, সঙ্গিনী ইত্যাদি

চ, ছ, জ অংশ

শ্রীমন্ত	—	সুভদ্রার বিবাহাকাঙ্ক্ষী যুবক
মনিময়	—	ঐ
কল্যাণ	—	সুভদ্রার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়
চক্রধর		সুভদ্রার উকিল
পৃথ্বিরাজ	—	ডাক্তার
চন্দ্রগুপ্ত	—	ঐ
নরোত্তমবাবু	—	সভাপতি
ডক্টর মুৎসুদ্দি	—	বক্তা
ভবভূতি শর্ম্মা	—	ঐ
গদাধরবাবু	—	ঐ
ঝুনঝুনওয়ালা	—	ঘৃতব্যবসায়ী মারোয়াড়ী
মোতিবাবু	—	পাথর গুঁড়ার ব্যবসায়ী

রিপোর্টার, ফোটোগ্রাফার, ভৃত্য ইত্যাদি

সুভদ্রা	—	ধনী তরুণী
জগদম্বা	—	সুভদ্রার মাতা

প্রথম অঙ্ক

ক দৃশ্য

খ্রীষ্টীয় ৭৮৫-৯০ সালের কথা। গৌড়নগরের প্রান্তে পুরাতন বাসুদেবের মন্দির; মন্দিরের বেদীর উপরে বাসুদেবের বিরাট কালো পাথরের মূর্ত্তি; মন্দিরের দুইটি দ্বার, একটি মূর্ত্তির বরাবর সম্মুখে, অপরটি বাম পাশে; মন্দিরের মধ্যে স্থান অল্প নয়, দরকার হইলে পঞ্চাশ জন লোক দাঁড়াইতে পারে; ভিতরের অবস্থা জীর্ণ, দেবতার বনেদী ভাব প্রকাশের জন্যই যেন সংস্কার করা হয় নাই। বেদীর দুই পাশে দুইটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, অন্য কোন আলো নাই; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

দূরে, নগর-প্রাচারের বাহিরে বিষম গোলমাল, কাল বর্ত্তমান হইলে মনে করা যাইত কোন জনতা রাজনৈতিক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আন্দোলন করিতেছে, কিন্তু আসল ব্যাপার গৌড়ের সৈন্যদল গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে

দুইজন ব্যক্তি দ্রুত ছুটিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; তাহাদের যোদ্ধৃবেশ, এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতেছে; দুইজনেই পরিশ্রান্ত; তন্মধ্যে একজন স্থূলকায়, তাহার অবস্থা শোচনীয়, অন্য সময় হইলে শোচনীয়ভাবে হাস্যকর বলিতাম

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ বাহির হইতে কে যেন দ্বারে আঘাত করিল। দুইজনের একতর কি বলিতে যাইতেছিল, স্থূলকায় ব্যক্তি অধরে তর্জ্জনী দিয়া নিষেধ করিল। কিন্তু ক্রমাগত দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল

জয়াপীড়। [স্থূলকায় ব্যক্তি] চুপ! চুপ! শব্দটি নয়।

চক্রপাণি। মিত্র হ'তে পারে।

জয়াপীড়। হয় হোক। কিন্তু দরজা খোলা হবে না।

চক্রপাণি। মিত্র হ'লে মারা পড়বে যে!

জয়াপীড়। আর শত্রু হ'লে যে আমরা মারা পড়ব!

চক্রপাণির মিত্রপ্রীতিতে বিরক্ত হইয়া দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল

চক্রপাণি। জয়াপীড়, দেখাই যাক না—কে!

জয়াপীড়। মিত্র হ'লে অভিজ্ঞান-বাক্য বলুক না!

চক্রপাণি। ঠিক বলেছ। [উচ্চকণ্ঠে] যদি মিত্র হও, অভিজ্ঞান-বাক্য বল।

[বাহির হইতে] জয়তু বাসুদেব।

চক্রপাণি। জয়াপীড়, এবার দরজা খোলা যাক।

জয়াপীড়। আবার বল।

[বাহির হইতে] জয়তু বাসুদেব।

চক্রপাণি। এবার হ'ল তো?

জয়াপীড়। এই গুর্জ্জরদের বিশ্বাস নেই; ওরা যাদু জানে; ওদের অভিজ্ঞান-বাক্য জানতে কতক্ষণ!

চক্রপাণি! না না, মিত্র। দরজা খুলতেই হবে, তুমি সর।

জয়াপীড়। দাঁড়াও, দরজা খোলার আগে আমার তলোয়ার খুলে নিই।

সে তলোয়ার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু তলোয়ার খাপের মধ্যে এমন আঁটিয়া গিয়াছে যে খুলিল না

চক্রপাণি। কি হ'ল হে?

জয়াপীড়। [পরিশ্রান্তভাবে] মরচে ধ'রে গেছে।

চক্রপাণি। কতবার বলেছি দাদা, তলোয়ারখানা মাঝে মাঝে খুলো। দেখ, এখন কি বিপদ! মরচে ধরল কবে?

জয়াপীড়। আজকে। আজ এত ঘেমেছি, মাথার ঘাম দরদর ক'রে খাপের মধ্যে প'ড়ে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে।

চক্রপাণি। তবু তো এখনও মাথার ঘাম পায়ে পড়ে নি।

জয়াপীড়। এবার পড়বে।

চক্রপাণি দরজা খুলিয়া দিল ; একজন সৈনিক দ্রুত ঢুকিল ; সে যুদ্ধক্লান্ত ; জয়াপীড় তলোয়ার খুলিবার আশা ছাড়িয়া খাপশুদ্ধ তলোয়ার উঁচাইল

চক্রপাণি। কল্যাণবর্ম্মা যে!

জয়াপীড় তাহার মুখের নিকটে মুখ আনিয়া নিঃসন্দেহ হইল

জয়াপীড়। হু, কল্যাণবর্ম্মা—নীল পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি।

চক্রপাণি। কল্যাণবর্ম্মা, সংবাদ কি?

কল্যাণবর্ম্মার অবস্থা কথা বলিবার মত নয়—এত ক্লান্ত, ইসারায় সে অপেক্ষা করিতে বলিল ; জয়াপীড় তখনও তলোয়ার টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে ; কিছুক্ষণ পরে

গৌড়ের সৈন্যের অবস্থা কি রকম? মারা পড়েছে?

কল্যাণবর্ম্মা। না।

জয়াপীড়। [উল্লসিতভাবে] জয় বাসুদেব।

কল্যাণবর্ম্মা। সব পালিয়েছে।

চক্রপাণি। পালিয়েছে?

জয়াপীড়। পালাল কেন?

কল্যাণবর্ম্মা। অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে একটা এই যে, আমাদের সৈন্য অল্প ছিল, ওদের বেশি।

জয়াপীড়। কাপুরুষ! অনেকে মিলে অল্পকে আক্রমণ!

কল্যাণবর্ম্মা। রাগলে চলবে কেন? যুদ্ধ তো প্রধানত কাপুরুষেরই বিদ্যা। সংখ্যায় বেশি হ'লে আক্রমণ কর, শত্রুকে সংখ্যায় বেশি দেখলে স'রে পড়।

জয়াপীড়। আমি তো তা বুঝি না।

কল্যাণবর্ম্মা। তুমি তো সৈনিক নও।

জয়াপীড়। শালার তলোয়ারের জন্যেই আজ এমন কথা শুনতে হ'ল।

চক্রপাণি। তা হ'লে গৌড়ের সেনা সব পালিয়েছে ?

কল্যাণবর্ম্মা। স-ব। নগরের প্রাচীরের বাইরে আর কোন সৈন্য নেই। এবার ওরা প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পারলেই নগর অধিকার করবে।

জয়াপীড়। [তলোয়ার টানিতে টানিতে] বলি, নগরের সব দ্বার তো বন্ধ করা হয়েছে ?

চক্রপাণি। কিন্তু তোমার নীল পদাতিক বাহিনী ?

কল্যাণবর্ম্মা। তারা পালায় নি।

চক্রপাণি। মরেছে ?

কল্যাণবর্ম্মা। তারা যুদ্ধই করে নি।

জয়াপীড়। যদিও আমি সৈনিক নই, তবু বলি, যুদ্ধ না করা কি পালানোর সামিল নয় ?

চক্রপাণি। যুদ্ধ না করবার হেতু ?

কল্যাণবর্ম্মা। গোপালদেব আদেশ করেন নি।

জয়াপীড়। কেন ?

কল্যাণবর্ম্মা। কেন! যেহেতু তিনি নাগরিক নন,—সৈনিক, তিনি রাজনৈতিক। নির্ব্বাচন না হয়ে গেলে তিনি যুদ্ধ করবেন না।

চক্রপাণি। নির্ব্বাচনের কি হচ্ছে ? নগরজ্যেষ্ঠেরা কি করছে ?

কল্যাণবর্ম্মা। তারা পুরশ্রীমণ্ডপে সমবেত হয়েছে।

জয়াপীড়। [তলোয়ার টানিতে টানিতে] সে যে যুদ্ধ করবার চেয়ে অনেক নিরাপদ। কিন্তু যুদ্ধ মিটে গেলে কি নির্ব্বাচন হ'তে পারত না ?

কল্যাণবর্ম্মা। গোপালদেব এর আগেও অনেকবার গৌড়ের অনেক

বিপদ উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন—তাঁর নীল পদাতিক বাহিনী দিয়ে। বল, তার কি ফল পেয়েছেন তিনি? অনেক ঠেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন।

জয়াপীড়। [তলোয়ার টানিতে টানিতে] এবার আমাদের শিক্ষা পাবার পালা।

চক্রপাণি। আঃ, থাম জয়াপীড়। কল্যাণবর্ম্মা, গোপালদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছেন?

কল্যাণবর্ম্মা। দুজন আছেন—দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ, আর উদ্দণ্ড-পুরেশ্বর কমলবর্ম্মা।

চক্রপাণি। বাসুদেব করুন, গোপালদেব নির্ব্বাচিত হোন। গৌড়ের এ মাৎস্য-ন্যায় দূর করবার ক্ষমতা আর কারও নেই।

কল্যাণবর্ম্মা। চক্রপাণি, গোপালদেবের আদেশ—পুরশ্রীমণ্ডপের নিকটে নীল পদাতিক বাহিনী নিয়ে আমাদের তিনজনকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

জয়াপীড়। [তলোয়ার টানিতে টানিতে] আমাকেও? তবে যে বড় আমাকে সৈনিক নই ব'লে ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের চেয়ে গোপালদেব অনেক বেশি বোঝেন।

কল্যাণবর্ম্মা। চল, ওই দেখ আলো দেখা যাচ্ছে, পুরবাসিনীরা বাসুদেবের মন্দিরে মানসিক পূজার অর্ঘ্য নিয়ে আসছে।

জয়াপীড়। [তখনও তলোয়ার টানিতেছে] চল, কিন্তু আমার তলোয়ারখানা—

কল্যাণবর্ম্মা। ওখানা ফেলে দাও, একখানা নতুন দেব।

জয়াপীড়। [বহু ভাবের সমাবেশে] আমি সৈনিক নই, কিন্তু তুমি কুপুত্র। বলি, জন্মান্তরবাদ মান? তবে এই তলোয়ারের ইতিহাস

শোন।—আমার পিতামহ ছিলেন বালুটিয়ার প্রসিদ্ধ কৈবর্ত্ত, মাছ ধরতেন, এই তলোয়ারের লোহা ছিল তাঁর বঁটি; আমার পিতা ছিলেন মাহিষ্যকুলপতি, সেই বঁটি দিয়ে তিনি লাঙল গ'ড়িয়ে নিয়েছিলেন; আর আমি তাঁদের বংশধর, তা দিয়ে তৈরি ক'রে নিয়েছি তলোয়ার। সেই তলোয়ার আমি ত্যাগ করব?

চক্রপাণি। আচ্ছা, তবে চল, সবাই মিলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা য'বে।

তিনজনের সম্মুখের দ্বার দিয়া প্রস্থান

মন্দিরের বাম পাশের দ্বার দিয়া পূজোপচার হাতে একদল পুরবাসিনীর প্রবেশ; বিবাহিতা ও কুমারী; তাহারা নগরের স্বস্তি-কামনায় নগরাধিপতি বাসুদেবে সন্তুষ্টি-কামনায় পূজা দিতে আসিয়াছে। তাহারা গানের সুরে নিম্নলিখিত স্তোত্রটি আবৃত্তি করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নৈবেদ্য ও অর্ঘ স্থাপন করিয়া প্রণাম করিল; সকলে সমস্বরে আবার গাহিল

"নাথ নারায়ণ বাসুদেব রঘুপতি রাজারাম"

পুনরায় প্রণাম করিয়া সকলে রিক্ত হাতে আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কেবল একটি কুমারী গেল না। মন্দির-বাহিরে গানের সুর দূরে মিলাইয়া গেলে সে বলিতে লাগিল। মহিলাটি গৌড়ের পরলোকগত ধনীতম শ্রেষ্ঠী চন্দ্রসেনের একমাত্র কন্যা; বয়স সতেরো হইতে পারে। সুন্দরী বটে, তেজস্বিনী; শুভ্র মর্ম্মরমূর্ত্তিতে প্রভাতের সূর্য্যালোক পড়িলে যেমন রৌদ্র চিক্কণ দেখায়; নাম ভদ্রা

ভদ্রা। [ব্যঙ্গস্বরে] নাথ নারায়ণ! বাসুদেব! কংসবিনাশন! পাথর, পাথর, পাথর! নগর আক্রান্ত হয়েছে, আর আমরা করছি স্তোত্র—নাথ নারায়ণ, বাসুদেব! পাথরের সামনে মাথা খুঁড়ছি, পোড়া কপাল আমাদের! আমার পিতার ব্যাধিতে শত স্বর্ণতুলসী-পত্র মানত করেছিলাম, বাঁচাতে পারলে? নির্ব্বাচিত গৌড়েশ্বর

ভীষ্মদেব [কণ্ঠে অশ্রুর আভাস] আমাকে কথা দিয়েছিল, হ'ল তা? সে যে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হ'ল, তা ঠেকাতে পারলে, সহস্র ভরি স্বর্ণ তো মানত করেছিলাম? নাথ নারায়ণ! বাসুদেব!

দরজা পর্য্যন্ত সে অগ্রসর হইয়া গেল, দেবমূর্ত্তির দিকে পিছন ফিরিয়া। সে যখন এই-ভাবে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় মূর্ত্তির অন্তরাল হইতে একখানি শীর্ণ কৃষ্ণ হস্ত বাহির হইয়া নৈবেদ্যের কলা সন্দেশ তুলিয়া লইল; বার দুই এমন ঘটিল। হঠাৎ ভদ্রা উদ্দীপ্তভাবে ফিরিয়া

দেব না আমি পূজা, ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমার নৈবেদ্য, যা হবার হোক, আর বেশি কি হবে!

অগ্রসর হইয়া আসিয়া নৈবেদ্য তুলিতে যাইবে, এমন সময় লক্ষ্য করিল নৈবেদ্যের সন্দেশ কলা নাই

[চমকিয়া] একি! এ কেমন ক'রে হ'ল? কে করলে এ কাজ? আমার নৈবেদ্য কে গ্রহণ করলে? কেউ তো এখানে নেই!

[ভীত বিস্ময়ে] এও কি সম্ভব, দেবতা গ্রহণ করেছে? তুমি নিয়েছ নারায়ণ? তুমি নিয়েছ বাসুদেব, আমার পূজা? তবে তুমি কেবলই পাথর নও!

নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বিনীত প্রার্থনার স্বরে

ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বাসুদেব, ক্ষমা কর মূঢ়ের প্রলাপ, ক্ষমা কর ব্যথিতের কাতরোক্তি। প্রভু, গৌড়কে রক্ষা কর, শত্রুর পরাজয় হোক। আর বিদেশী শত্রুর চেয়ে যে বড় শত্রু আজ গৌড়েশ্বর নির্ব্বাচিত হ'তে যাচ্ছে তার যেন পরাজয় ঘটে। যাকে কখনও দেখি নি, জানি না, সে হবে গৌড়েশ্বর! সে শ্রেষ্ঠীশ্রেষ্ঠ চন্দ্রসেনের

কন্যাকে আদেশ করবে!···আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হোক, মনে বল দাও প্রভু ; আমি জানি সেই হচ্ছে ভীষ্মদেবের মৃত্যুর কারণ।

বল্লভার প্রবেশ ; বৃদ্ধা ; ভদ্রার পরিচারিকা, অভিভাবিকা ; তার হাতে একখানি ওহাড়নী—মেয়েদের গায়ে দেবার মূল্যবান চাদর

বল্লভা। যা ভেবেছি, ঠিক এখানে। ওমা, এত রাত্রে একা! নাও নাও, চাদরখানা গায়ে দাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

ভদ্রা। বল্লভা, আমি এখনও খুকী নাকি?

বল্লভা। বুড়োদের কি ঠাণ্ডা লাগে না? আরও বেশি লাগে। আর তুমি খুকী ছাড়া কি? সেই বড় বন্যা যেবারে হ'ল, নগরের বাজার পর্য্যন্ত জল এসেছিল, ওই যে বাইরে ওখানে বটগাছ দেখছ, ওরই শেকড়ে বেঁধেছিল সব নৌকা, সেবার হ'ল তোমার জন্ম। খুকী ছাড়া আবার কি? আর সেই যে বড় ভূমিকম্প হ'ল, ওমা, নগরের অদ্ধেক ঘরবাড়ি প'ড়ে গিয়েছিল, বেলা তিন পহরের সময় ধূলোয় সব ধূলোকার ; বলতে নেই, সেবারে বাসুদেবের মন্দিরেও ফাটল ধরেছিল, সেবারে হ'ল তোমার বাপের বিয়ে, সে আর ক বছর হ'ল, দাঁড়াও গুণে দেখি। [আঙুলে গণনা] এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত, দশ, বারো, চোদ্দ, নয়, তেরো—যাঃ আঙুল ফুরিয়ে গেল। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] অনেক দিন হ'ল। তোমার বাপ মা তোমাকে আমার জিম্মায় রেখে গেছে, আর বল কিনা তোমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে না?

ভদ্রা। [স্নেহার্দ্রভাবে] পারে বই কি বল্লভা।

বল্লভা। তবে? নাও, গায়ে দাও।

ভদ্রা। [চাদর গায়ে দিল, কিম্বা বল্লভা গায়ে দিয়া দিল] এবার তো হয়েছে?

বল্লভা। হ'ল আর কই! চল।

ভদ্রা। তুমি যাও, আমি আসছি।

বল্লভা। এত রাত্রে, একলা, বাইরে শত্রু! চল, চল।

ভদ্রা। আমার প্রার্থনা আর একটু বাকি আছে।

বল্লভা। ও প্রার্থনা তো বহুবার করেছ, শোনবার হ'লে দেবতা শুনেছেন।

ভদ্রা। আমি জানি শুনেছেন।

বল্লভা। না শুনলেই ভাল। কিন্তু গোপালদেবের ওপরে তোমার এত রাগ কেন?

ভদ্রা। [উদ্দীপ্তভাবে] হবে না রাগ? জান না, সে আমার কত বড় সর্ব্বনাশ করেছে?

বল্লভা। ভীষ্মদেবকে সে তো হত্যা করে নি। তখন তো সে গৌড়ে ছিল না।

ভদ্রা। ভীষ্মদেব আমাকে কথা দিয়েছিল—

বল্লভা। বিয়ে করবে! ওমা মা, চন্দ্রসেনের মেয়ের নাকি বরের অভাব! কত ভীষ্মদেব ঘোরাঘুরি করছে! মণিভদ্র ঢেকুরের রাজা, বেচারা তোমার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছে, তোমার তাতে মন ওঠে না!

ভদ্রা। তুমি তাকে বিয়ে কর গে।

বল্লভা। বয়স গিয়েছে ভদ্রা, বয়স গিয়েছে। সেই বড় ভূমিকম্পের বার—

ভদ্রা। দোহাই তোমার, আর গুণতে সুরু ক'র না।

বল্লভা। আচ্ছা গুণব না। কিন্তু তুমি গোপালদেবের বিরুদ্ধভাব ছাড়।

ভদ্রা। ছাড়ব, ছাড়ব। তুমি এগোও, আমি আসছি।

বল্লভা। [নিতান্ত অনিচ্ছাভরে] আচ্ছা, যাচ্ছি। তুমি দেরি ক'র না কিন্তু।

ভদ্রা। না, দেরি হবে না।

বল্লভা অগ্রসর হইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া

বল্লভা। ঠাণ্ডা লাগিও না যেন, ওহাড়নীখানা গায়ে রেখ। আর একখানা পুরু দেখে দিয়ে যাব নাকি?

ভদ্রা। না না, তুমি যাও।

বল্লভার প্রস্থান

ভদ্রা দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইতে গেলে কাঁচুলির আড়াল হইতে একখানা ছোরা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে দ্রুত তুলিয়া লইয়া একবার দেখিল

চন্দ্রহাস ছোরা আমার, পক্ষিরাজ ঘোড়া আমার, পারবে, পারবে বাছা।

চুমা খাইয়া ছোরা কাঁচুলির মধ্যে রাখিয়া দিল

ছোরা পারবে, আমি পারব না, ও মেয়েমানুষের কাজ নয়।

মণিভদ্রের প্রবেশ; ঢেকুরের রাজা; যুবক, বীরোচিত মূর্ত্তি; ভদ্রার প্রণয়ী; ভদ্রা তাহ'কে দেখিতে পারে না

মণিভদ্র, আবার এখানে এসেছ?

মণিভদ্র। ভদ্রা, তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পার নি;

ভদ্রা। খুব পেরেছি।

মণিভদ্র। নিশ্চয় পার নি। তুমি ভাবছ যে আমি দেবদর্শন করতে এসেছি, বাস্তবিক তা নয়, আমি এসেছি দেবী-সন্দর্শনে।

ভদ্রা। নাস্তিক।

মণিভদ্র। এ তোমার অন্যায়। দেবতা আমাকে নাস্তিক বলতে পারেন, তুমি বল কোন্ দুঃখে?

ভদ্রা। মণিভদ্র, এখন পরিহাসের সময় নয়।

মণিভদ্র। সেইজন্যই তো এসেছি।

ভদ্রা। তোমাকে তো একশো বার বলেছি, আশা নেই।

মণিভদ্র। বেশি বলেছ ব'লেই আশা ছাড়তে পারি নি।

ভদ্রা। তবে আজ শেষ বার বলছি, তোমার আশা নেই।

মণিভদ্র। ভদ্রা, মনের আশা গাছের কাঁচা ফলের মত, সহজে পড়তে চায় না।

ভদ্রা। সাহিত্যিক হয়ে উঠলে নাকি?

মণিভদ্র। সময় খারাপ ভদ্রা, যদি কোন দূর ভবিষ্যতে গৌড়দেশে জন্মাতাম তবে হয়তো বা সাহিত্যিক হতাম। তবে আমার অস্ত্র এই।

তলোয়ার প্রদর্শন

ভদ্রা। [হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া গেল] আচ্ছা, তুমি এক কাজ করতে পারবে?

মণিভদ্র। আদেশ কর।

ভদ্রা। নাঃ, তোমার কাজ নয়, তোমার অসাধ্য।

মণিভদ্র। জগতে আমার অসাধ্য একটিমাত্র কাজ আছে ব'লে জানতাম।

ভদ্রা। কি সেটা?

মণিভদ্র। তোমার চিত্তজয়।

ভদ্রা। চুপ।

মণিভদ্র। যে আদেশ।

ভদ্রা। তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করতে পারি না, চললাম।

মণিভদ্র। চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, রাত্রি অন্ধকার, তাতে বিপদের সময়।

ভদ্রা। তোমার সঙ্গে যেতে আমার ভয় আরও বেশি।

মণিভদ্র। নারীসুলভ একটা গুণও অন্তত তোমার আছে জেনে আশ্বস্ত হলাম।

ভদ্রা। ভয়কে বলছ নারীসুলভ গুণ?

মণিভদ্র। বল কি! ভয় না থাকলে নারী কখনও পুরুষকে আশ্রয় করত?

ভদ্রা। আমি চললাম, তোমার কিন্তু আমার সঙ্গে যাওয়া চলবে না।

মণিভদ্র। বেশ, এখানেই রইলাম।

ভদ্রা। না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, একটু পরেই হয়তো পেছনে পেছনে ছুটবে। এক কাজ কর।

মণিভদ্র। বল।

ভদ্রা। নতজানু হও।

মণিভদ্র। ওটাতে অভ্যস্ত আছি।

ভদ্রার সম্মুখে নতজানু হইল

ভদ্রা। নাস্তিক। ওই দিকে ফিরে, দেবতার কাছে।

মণিভদ্র। আচ্ছা তাই, হ'ল এবার?

ভদ্রা। বাসুদেবের মন্ত্র একশো বার জপ কর।

মণিভদ্র। বেশ, তারপর?

ভদ্রা। তারপরে মন্দির ছাড়বে, ততক্ষণে আমি বাড়ি গিয়ে পৌছব। বল, নাথ নারায়ণ বাসুদেব।

মণিভদ্র। নাথ নারায়ণ বাসুদেব।

ভদ্র। থেম না, বলতে থাক।

মণিভদ্র। [নতজানুভাবে] নাথ নারায়ণ বাসুদেব।

ভদ্রার প্রস্থান

মণিভদ্র মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মন্ত্রের শব্দের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল

[আবৃত্তির সুরে] নাথ নারায়ণ বাসুদেব, নাথ নারায়ণ ভদ্রা দেব···নাথ নারায়ণ ভদ্রা দেবী···চন্দ্রসেন-কন্যা বাসুদেব···ভদ্রা সুন্দরী···চম্পকবরণী···ভদ্রা···মোটেই···আমাকে ভালবাসে না···কি যে করি আমি···না পারি বুঝতে···তিরস্কার তার লাগে ভাল···ভদ্রা··· ভদ্রা···ভদ্রা···মধুময় নামটি···ভদ্রা···

সম্মুখের দ্বার দিয়া তিনজন নাগরিকের প্রবেশ—নাগভট্ট, ইন্দ্রদত্ত, ঈশ্বরঘোষ! নাগভট্ট ধনী শ্রেষ্ঠী, গৌড়রাজকোষে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দান করিয়াছে, গৌড়ের বহু শ্রেষ্ঠ নাগরিক তাহার কাছে ঋণী; ইন্দ্রদত্তের বৃহৎ সোনারূপার কারবার; ঈশ্বরঘোষ জাতিতে কর্ম্মকার, তাহার বিরাট অস্ত্রের কারখানা, গৌড়ে এবং গৌড়ের বাহিরে সে অস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। তিনজনেই প্রৌঢ়, তাহারা মণিভদ্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহারা মণিভদ্রকে ভাল রকমে জানে। তাহারা মণিভদ্রের আবৃত্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল

নাগভট্ট। দেখ দেখ, প্রেমিক যখন পূজারী হয়, তার মন্ত্রে কি পরিবর্ত্তন ঘটে!

মণিভদ্র লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল

মণিভদ্র! তোমরা কখন এলে? আমার আবৃত্তিতে কিছু গলদ হচ্ছিল, না?

ইন্দ্রদত্ত। কিচ্ছু না।

নাগভট্ট। একটু হচ্ছিল বই কি। 'নাথ নারায়ণ'-টুকু বাদ দিলেই একেবারে নির্জ্জলা হ'ত।

মণিভদ্র। ওহে, তোমরা তো তিনজনে মিলে গৌড়ে অসাধ্যসাধন

ক'রে থাক, লোকে তোমাদের তিনজনকে ঠাট্টা ক'রে ব'লে থাকে —ত্রিপিটক।

নাগভট্ট। কি বলছ মণিভদ্র! আমরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র।

মণিভদ্র। ব্যবসায়ী বই কি। তোমরা হচ্ছ রাজব্যবসায়ী; গৌড়ের রাজা নির্ব্বাচন, সে তো তোমরাই ক'রে থাক।

ঈশ্বরঘোষ। তোমার আবেদনটি কি?

মণিভদ্র। ভদ্রাকে আমার প্রতি প্রসন্ন ক'রে দিতে পার?

নাগভট্ট। ও বাবা! ও আমাদের ঈশ্বরঘোষের কাজ, ওর ব্যবসা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

ঈশ্বরঘোষ। তলোয়ারে মানুষকে রক্তাক্ত করতে পারে। অনুরক্ত— অসম্ভব। ও আমাদের স্বর্ণরাজ ইন্দ্রদত্তের কাজ।

ইন্দ্রদত্ত। আমার স্বর্ণ ও রূপার কারবার বটে, কিন্তু যে নারীর স্বর্ণ ও রূপ স্বয়ং ভগবানদত্ত, তাকে আমি কি করব? তার চেয়ে গোপালদেবের কাছে যাও, সে বোধ হয় এতক্ষণে নির্ব্বাচিত হ'ল।

মণিভদ্র। তোমরা থাকতে গোপালদেবের কাছে? সে তো তোমাদের হাতের পুতুল।

নাগভট্ট। মণিভদ্র, গোপালদেব হয়তো পুতুল নয়; এবারে আমাদের পরীক্ষা উপস্থিত।

ঈশ্বরঘোষ। লোকটা আস্ত একখানা ইস্পাতের তলোয়ারের মত, শীতল আর তীক্ষ্ম, কখনও রাগতে দেখিনি; ও লোক বড় সহজ নয়।

মণিভদ্র। তবে ওকে রাজা করছ কেন?

নাগভট্ট। গোপালদেব ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই গৌড়ের শত্রুদের

জয় করে। আর গৌড়ে শান্তি স্থাপিত না হ'লে আমাদের ব্যবসা মাটি হ'তে বসেছে।

মণিভদ্র। বুঝেছি। তোমরা চাও, তোমাদের ব্যবসার সুবিধার জন্যে একজন দেশে শান্তি স্থাপন ক'রে দেবে; কিন্তু যা চাও, তার বেশি সে যদি হয়?

নাগভট্ট। সেইজন্যই তো এসেছি, বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে।

মণিভদ্র। বটে, তোমাদের এখনও পাথরের দেবতার ওপরে বিশ্বাস আছে!

ইন্দ্রদত্ত। সোনার কারবার যে করে, সোনার চেয়ে তার অনেক বেশি বিশ্বাস কালো পাথরখানার ওপরে—যাকে বলে কষ্টিপাথর। আমাদের বাসুদেবও যে কষ্টিপাথরে গড়া।

নাগভট্ট। নাও, আবার কে এসে পড়বে! আজ বিপদের দিনে সবারই বাসুদেবকে মনে পড়েছে।

চারজনে নতজানু হইয়া বসিল

মণিভদ্র, তুমি ভাই তোমার মন্ত্রগুলো ব'ল না।

সকলের মন্ত্র আবৃত্তি

বাসুদেব, গোপালদেব যেন গুর্জ্জরপতি বৎসরাজকে জয় ক'রে গৌড়ে শান্তি স্থাপন করতে পারে, তোমাকে আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেব।

ইন্দ্রদত্ত। বাসুদেব, আমাদের ব্যবসায় যেন অপ্রতিহতভাবে চলে, তোমাকে সোনার মুকুট গড়িয়ে দেব।

ঈশ্বরঘোষ। বাসুদেব, গোপালদেবকে যেন আমরা সর্ব্বদা আয়ত্তে রাখতে পারি, তোমার নতুন মন্দির প্রস্তুত ক'রে দেব।

মণিভদ্র। বাসুদেব, এতগুলো জিনিস পেয়েও তোমার কিছু অভাব

থাকবে কিনা জানি না, যদি থাকে—ঢেকুরে তোমার মন্দির গড়িয়ে দেব। ভদ্রার মনটাকে একটু নরম ক'রে দাও প্রভু। কষ্ট ক'রে তোমাকে সশরীরে যেতে হবে না, স্বপ্নাদেশ দিলেই চলবে।

নাগভট্ট। চল, এবার পুরশ্রীমন্দিরে যাওয়া যাক, ওদিকে কি হচ্ছে কে জানে!

চারজনের সম্মুখের দ্বার দিয়া প্রস্থান

বাম পাশের দ্বার দিয়া প্রথমে গোপালদেব, পিছনে পিছনে কল্যাণবর্ম্মা, চক্রপাণি ও জয়াপীড়ের প্রবেশ; জয়াপীড় তলোয়ার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। গোপালদেবের বয়স চল্লিশের কাছে; দীর্ঘদেহ যোদ্ধবেশ; তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইস্পাতে গড়া, চেহারার মধ্যে অনৈসর্গিক একটা দীপ্তি, তাহাকে তীক্ষ্ণতা বলিলেই ঠিক হয়; তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা বৃথা; সাধারণত সে বুকের উপরে দুই হাত আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দাঁড়ায়; গলার স্বর গম্ভীর, কথা জোরে বলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস লাগে—শ্রোতা বুঝিতে পারে না পরিহাস না সত্য

গোপালদেব। [বিশেষ করিয়া কল্যাণবর্ম্মার প্রতি] সমতটের যুদ্ধের কথা মনে আছে? এবারেও সেই রকম ক'রে আক্রমণ করতে হবে। আমাদের নীল পদাতিক বাহিনীর দুই পার্শ্ব এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ না ক'রে কেবল আত্মরক্ষা করতে থাকবে, গুর্জ্জরের সৈন্য আমাদের হটিয়ে দেবার জন্য তাদের দুই পার্শ্ব শক্তিশালী করতে থাকবে, তাতে তাদের বাহিনীর মধ্যদেশ দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল মধ্যদেশে সমবেত থাকবে; ওদের মধ্যদেশ যথেষ্ট হীনবল হয়ে পড়লে আমার সঙ্কেতমাত্রে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী ওদের মধ্যদেশ ভেদ করবে, তখন শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত হবে, যুদ্ধও জয় হবে।

কল্যাণবর্ম্মা। আমার মনে থাকবে।

গোপালদেব। চক্রপাণি, তুমি একদল সৈন্য নিয়ে মহানন্দার যেখানে সেতুবন্ধ ক'রে গুর্জ্জর সেনা পার হয়েছে, সেখানে যাও; সেই সেতু দখল করতে হবে। সেতু দখল করবার সংবাদ দ্রুত অশ্বারোহী দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। তোমার সংবাদ পেলেই আমরা ওদের আক্রমণ করব, আজ শেষ রাত্রেই।

চক্রপাণি। আমি চললাম।

জয়াপীড়। আজ থেকে গৌড়ে নবযুগ আরম্ভ হ'ল।

গোপালদেব। আমি নবযুগে বিশ্বাস করি না।

জয়াপীড় এ হেন বাক্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল

পুরাতন যুগের কর্ত্তব্য কি আমরা শেষ করতে পেরেছি? তবে নবযুগের জন্য এত তাড়া কেন? তোমরা এগোও, আমি একটু একলা থাকব।

তিনজনে বাম পার্শ্বের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল

কল্যাণবর্ম্মা, নির্ব্বাচনের সঙ্কেত কি?

কল্যাণবর্ম্মা। দণ্ডভুক্তিরাজ হ'লে একবার শঙ্খধ্বনি, উদ্দণ্ডপুরেশ্বর হ'লে দুবার, গোপালদেব হ'লে তিনবার।

গোপালদেব। এবার যেতে পার।

তিনজনের প্রস্থান

গোপালদেব বাসুদেব-মূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মানুষ যেমন দেবতাকে বলে, ভক্ত যেমন ভগবানকে বলে, নীচ যেমন উচ্চকে বলে, তেমন ভাবে নয়, বন্ধু যেমন বন্ধুকে বলে—যেন সমানে সমানে কথা—

হে শিলামূর্ত্তি, সারা জীবন নিজের দোসর খুঁজে ফিরেছি, যে আমার মত নিস্পৃহ, নিষ্কাম, ভাবলেশহীন; যার মনের কথা

মুখের ভাবে প্রকাশ পায় না, বাইরের আঘাতে যার অভ্যন্তরে প্রতিঘাত উত্থিত হয় না, সেই দোসর আমার কে ?

লোকে তোমাকে দেবতা বলে, তোমার কাছে তারা করে প্রার্থনা; আমি জানি, তুমি আমার সমকক্ষ, তোমার কাছে আমি বলব মনের কথা।

হে শিলামূর্ত্তি, তোমার নিস্পন্দ নেত্র কত যুগ ধ'রে অতীতের দিকে বাক্যহীন বেদনায় প্রসারিত, আর আমার নির্ব্বাক দৃষ্টি ভবিষ্যতের হিমান্ধকার খিলানের মধ্যে ধাবমান; তুমি অনাদি, আমি অনন্ত; তুমি প্রস্তর, আমি ধাতব; তুমি পাথরে গড়া রক্ত-মাংসের দেবতা, আমি রক্ত-মাংসে গড়া পাথরের অতিমানুষ; দুজনেই আমরা দেখছি কৃপামিশ্রিত করুণায়—আমাদের পদপ্রান্তে বালখিল্য মানুষের লীলা। আমাদের কেউ বোঝে না, জানে না, চেনে না। আমরা কি পরস্পরকে বুঝি, জানি, চিনি ?

গোপালদেব যখন বলিতেছিল, "হে শিলামূর্ত্তি" ইত্যাদি, সেই সময়ে ভদ্রা সম্মুখের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে একজন বীরোচিত মূর্ত্তিকে বাসুদেবের মূর্ত্তির সঙ্গে আলাপ করিতে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, ভীত হইল, পলাইতেও ভুলিয়া গেল, স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় গোপালদেব পিছন ফিরিতে তাহাকে দেখিল

ভদ্রা। তুমি কে ?

গোপালদেব। দেবমন্দিরে দেবতার ছাড়া আর কারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই।

ভদ্রা। তুমি দেবতা, না মানুষ ?

গোপালদেব। আমি অতিমানুষ।

ভদ্রা। অতিমানুষ! না না, তুমি দেবতা।

গোপালদেব। মানুষ বলার চেয়ে সে পরিচয় অধিকতর সত্য।

ভদ্রা। না, তুমি দেবতা! তোমাকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।

গোপালদেব। আমাকে? কেন?

ভদ্রা। তুমি দেবতা, তাতে তুমি স্বপ্নাদিষ্ট, তোমাকে বলতে ক্ষতি নেই। কদিন থেকে আমি বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য! কাল রাত্রে স্বপ্নে আদেশ পেলাম, যে আমার বাসনা পূরণ করবে, তার দেখা পাব বাসুদেবের মন্দিরে। আমি এসেছিলাম বাসুদেবের পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে যাবার জন্য, পেলাম তোমার দেখা।

গোপালদেব। কি তোমার মনোবাঞ্ছা?

ভদ্রা। [ইতস্তত করিয়া] না, তোমাকে বলতেই হবে, তুমি স্বপ্নাদিষ্ট। তুমি গোপালদেবকে চেন?

গোপালদেব। তাকে না চেনে কে?

ভদ্রা। তোমাকে বলতেই হবে। আমি সেই গোপালদেবকে হত্যা করতে চাই।

গোপালদেব। বেশ। কিন্তু তার অপরাধ কি?

ভদ্রা। অপরাধ? তুমি তো এখনই বলছিলে তুমি পাথর, মানুষের দুঃখ বুঝতে পারবে?

গোপালদেব। বল।

ভদ্রা। গৌড়েশ্বর ভীষ্মদেবের মৃত্যুর কারণ সে।

গোপালদেব। গোপালদেব!

ভদ্রা। নিজে সিংহাসন লাভ করবার জন্য সে লোক দিয়ে তাঁকে হত্যা করিয়েছে; আমি ছিলাম ভীষ্মদেবের বাগ্‌দত্তা।

গোপালদেব। এবার বুঝলাম।

ভদ্রা বুঝলে? তা হ'লে তুমি আগাগোড়া পাথর নও?

গোপালদেব। পাথরেও তো ফাটল থাকে। আমাকে কি করতে হবে?

ভদ্রা। তুমি বীরপুরুষ, হয়তো দেবতা; নারীর পক্ষে যা সম্ভব নয়, সেই কাজ তোমাকে করতে হবে।

গোপালদেব। তা হ'লে গোপালদেবের হত্যার ভার আমার ওপরে?

ভদ্রা। প্রত্যাখ্যান ক'র না। কিন্তু গোপালদেব যদি রাজা নির্ব্বাচিত হয়, তবেই তাকে হত্যা করবে।

গোপালদেব। তথাস্তু। তার পরিবর্ত্তে আমি কি পাব?

ভদ্রা। পরিবর্ত্তে? তুমি যদি দেবতা না হয়ে মানুষ হ'তে, আমি তোমাকে বিবাহ করতাম।

গোপালদেব। আমি মানুষ কি না, সে প্রমাণ তো এখনও হয় নি।

ভদ্রা। আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না। এই নাও ছোরা।

ছোরা বাহির করিয়া দিল, গোপাল লইল

কোথায় তোমার দেখা পাব?

গোপালদেব। এই মন্দিরে—এখানে।

ভদ্রা। তা হ'লে আমি নির্ব্বাচনের সঙ্কেত শুনলেই আসব।

ভদ্রা, বাসুদেব ও গোপালদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল; যাইবার সময়ে ভক্তিভরে 'নাথ নারায়ণ' আবৃত্তি করিতে করিতে বাসুদেবের নির্ম্মাল্য লইয়া গেল

গোপালদেব। বিধাতার হাস্যরসজ্ঞান একেবারে নেই, এমন কথা বলা চলে না।

হঠাৎ বাহিরে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল; গুর্জ্জর সৈন্য পুনরায় আক্রমণ করিয়াছে ও প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সুরু করিয়াছে। জয়াপীড়ের দ্রুত ব্যস্তভাবে প্রবেশ

জয়াপীড়। গোপালদেব, তলোয়ার—তলোয়ার খুলুন।

গোপালদেব। কি হয়েছে ?

জয়াপীড়। গুর্জ্জর সৈন্য প্রাচীর লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছে। গোপালদেব, নীল পদাতিকদের আক্রমণ করবার আদেশ দিন।

গোপালদেব। নির্ব্বাচন না হয়ে গেলে তারা একটি আঙুলও তুলবে না।

জয়াপীড়। সর্ব্বনাশ! নির্ব্বাচন কি আর আজ হবে! তারা তর্ক করছে, যুক্তি দেখাচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, শাস্ত্র আওড়াচ্ছে, সে কি আর আজ শেষ হবে!

গোপালদেব। এইবার হবে; গুর্জ্জরদের এই আক্রমণে ভালই হয়েছে।

জয়াপীড়। ভালই হয়েছে!

হঠাৎ সম্মুখের দ্বার দিয়া চক্রপাণি ও একজন গুর্জ্জর সৈন্য অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ করিল; চক্রপাণি বাসুদেবের মূর্ত্তির দিকে পিছন ফিরিয়া, গুর্জ্জর সৈন্য দেবমূর্ত্তির মুখোমুখি; দুইজনেই নিপুণ অসিচালক; চক্রপাণি শেষে জিতিবে, কাজেই সে অপেক্ষাকৃত অধিক নিপুণ। জয়াপীড় ব্যস্তভাবে সরিয়া গেল

গোপালদেব। জয়াপীড়, পালাচ্ছ নাকি ?

জয়াপীড়। পালাব কেন মহারাজ ? চক্রপাণিকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি তলোয়ারখানা খুলুন।

গোপালদেব। কোন দরকার হবে না, চক্রপাণি একাই পারবে। কি চক্রপাণি, অসুবিধা হচ্ছে নাকি ?

চক্রপাণি। [অসি চালনা করিতে করিতে] যাত্রাদলে বরাবর দেখেছি— অসিযুদ্ধ ও বাক্‌যুদ্ধ একসঙ্গে করে, শুধু অসিযুদ্ধে তাই অসুবিধা হচ্ছে।

গোপালদেব। বাক্‌যুদ্ধে আপত্তি কি ?

চক্রপাণি। ভয় হয়, শেষে লোকে কবি বলতে সুরু করবে।

দুইজনের যুদ্ধ ; জয়াপীড় ভীত ; গোপালদেব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ; গুর্জ্জর সৈন্য ক্রমে হটিতে হটিতে দরজা দিয়া প্রস্থান করিল ; চক্রপাণির পশ্চাদ্ধাবন ; জয়াপীড় দরজা পর্য্যন্ত গিয়া বলিল

জয়াপীড়। ভাই চক্রপাণি, লোকটাকে একেবারে নিকেশ ক'রে ফেল, নইলে ও গিয়ে খবর দেবে যে, আমরা এখানে আছি।

নগরের মধ্যে উল্লাসধ্বনি

গোপালদেব। ও কিসের শব্দ ?

জয়াপীড়। বোধ হচ্ছে নির্ব্বাচন শেষ হ'ল।

গোপালদেব। দেখলে তো কাজটা কেমন তাড়াতাড়ি হ'ল। এ আক্রমণটা না হ'লে আজ সমস্ত রাত্রেও শেষ হ'ত না। কিন্তু কে নির্ব্বাচিত হ'ল ?

জয়াপীড়। ওই যে শঙ্খধ্বনি !

শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল ; জয়াপীড় ও গোপালদেব স্থির হইয়া শুনিতে আরম্ভ করিল ; সবসুদ্ধ তিনবার শঙ্খধ্বনি হইবে, প্রত্যেক বারের মধ্যে আধ মিনিটের কালচ্ছেদ ; তৃতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে নগরে বিরাট জয়োল্লাস উঠিবে, কারণ গোপালদেব নির্ব্বাচিত হইয়াছেন

একবার।

শঙ্খধ্বনি

দুইবার।

শঙ্খধ্বনি

তিনবার। মহারাজ ! মহারাজ, আমার সৌভাগ্য আপনাকে সকলের আগে সম্বর্দ্ধনা করবার সুযোগ পেলাম।

সম্মুখের দ্বার দিয়া দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ ও উদ্দণ্ডপুরেশ্বর কমলবর্ম্মা এবং নগরজ্যেষ্ঠদের প্রবেশ ; বাম পার্শ্বের দরজা দিয়া ভদ্রার দ্রুত প্রবেশ ; সে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইল ; এই জনতার অর্থ সে বুঝিতে পারিতেছে না ; নগরজ্যেষ্ঠ প্রভৃতির পিছনে কল্যাণবর্ম্মা ও চক্রপাণির প্রবেশ

সকলে। [সমস্বরে] জয় পরমভট্টারক পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের জয়।

সকলে নতজানু হইয়া গোপালদেবের পায়ের কাছে নিজ নিজ তলোয়ার স্থাপন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল

গোপালদেব। রাজগণ, নগরজ্যেষ্ঠগণ, আপনারা উঠুন ; গৌড়ের শত্রু জয় ক'রে এসে আপনাদের সৌজন্যের উত্তর দেব ; আপনারা আমার জন্য পুরশ্রীমণ্ডপে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

জয়াপীড়, চক্রপাণি, কল্যাণবর্ম্মা এবং ভদ্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ভদ্রা সকলের পিছনে কোনমতে দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

কল্যাণবর্ম্মা, তুমি মহাসন্ধিবিগ্রহিক।

কল্যাণবর্ম্মা। যে আদেশ।

গোপালদেব। চক্রপাণি, তুমি মহাসামন্ত।

চক্রপাণি। যে আদেশ।

গোপালদেব। জয়াপীড়, তুমি কোষাধ্যক্ষ।

জয়াপীড়। যে আদেশ ; তবে মহারাজ, এগুলি লিখে দিলে ভাল হ'ত না !

গোপালদেব। কেন ?

জয়াপীড়। হঠাৎ মহারাজ ভুলে গেলে —

গোপালদেব। কেন ? আমার স্মৃতিশক্তি তো ক্ষীণ নয়।

জয়াপীড়। আজ্ঞে, তা দেখেছি, যেদিন যে অপরাধ করেছি, সব

সব মহারাজের মনে আছে। কোষাধ্যক্ষ হ'লে তো যুদ্ধে যাওয়া চলবে না। জীবনে একটাই সখ ছিল তাও পূর্ণ হ'ল না।

গোপালদেব। কল্যাণবর্ম্মা, তখন যে ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, সেই ভাবে যুদ্ধ চালনা করতে হবে, তুমি এগোও।

কল্যাণবর্ম্মার প্রস্থান

চক্রপাণি, তুমি মহানন্দার সেতু অধিকার করতে যাত্রা কর। যে সব গুর্জ্জর সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করবে, বা দেশে ফিরে যেতে রাজি হবে, তাদের ছেড়ে দিও।

জয়াপীড়। এই তো বিপদ করলেন মহারাজ, ছেড়ে দিলেই ওরা আবার এসে লড়াই সুরু করবে। কিন্তু কোষাধ্যক্ষের, বোধ করি, যুদ্ধবিষয়ে কথা বলা উচিত নয়!

চক্রপাণির প্রস্থান

গোপালদেব। জয়াপীড়, তুমিও এগোও।

জয়াপীড়। যে আজ্ঞে। এতদিনে গৌড়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হ'ল।

গোপালদেব। জনগণকে ভোলাবার পক্ষে গণতন্ত্র অতি উত্তম উপায়; কিন্তু যদি তারা সত্যই মনে করে, তারাই শাসন-ব্যবস্থার কর্ত্তা, তখনই দুর্দ্দিন।

জয়াপীড়। কেন, মহারাজ?

গোপালদেব। কেন? যেহেতু লক্ষ জন লোকের মধ্যে একজনও চিন্তা করতে পারে কিনা সন্দেহ।

জয়াপীড়। চিন্তা করতে পারে না!

গোপালদেব। না। দশটা অশুভ বুদ্ধির সংযোগে একটা শুভ বুদ্ধি হয় না; পাঁচশো মানুষের চোখ একত্র হ'লেই সহস্রচক্ষুর দিব্যদৃষ্টি লাভ করে না; মূঢ় জনতা নিজের ভালমন্দ বোঝে না; অন্য

একজনকে তাদের হয়ে, সে কাজ করতে হয়—একেই বলে গণতন্ত্র। বুঝলে ?

জয়াপীড়। ঠিক বলতে পারছি না; বাড়িতে গিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখব।

গোপালদেব। আচ্ছা, এখন যাও।

জয়াপীড়ের প্রস্থান

গোপালদেব ভদ্রার দিকে ফিরিল; স্তম্ভিত বিস্মিত ক্ষুব্ধ ভীত ভদ্রা কোন রকমে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে

আর্যে, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলাম না, যেহেতু শাস্ত্রে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ।

ছুরিখানা ফিরাইয়া দিল, ভদ্রা যন্ত্রচালিতের মত গ্রহণ করিল

এই নাও তোমার ছুরি। একেবারে হতাশ হবার প্রয়োজন দেখি না, অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করিও; উপকারীকে হত্যা করবার লোকের অভাব গৌড়ে হবে না। এবার যেতে পারি ?

প্রস্থান

ভদ্রা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ বাসুদেব মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে

ভদ্রা। নারায়ণ! বাসুদেব! দেবতা! পাথর, পাথর, পাথর!

পূজার নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিয়া

পাথর, পাথর! নারায়ণ! বাসুদেব!

হঠাৎ একখানি থালা তুলিয়া লইয়া পাথরের মূর্ত্তির উপরে নিক্ষেপ করিল; পাথরে ঠেকিয়া থালা ঝনঝন করিয়া প'ড়িয়া গেল

পাথর, পাথর!

চীৎকার করিতে করিতে বেগে প্রস্থান

মন্দির নির্জ্জন হইয়া গেলে বাম পার্শ্বের দ্বার দিয়া দুইজন ব্রাহ্মণবটু সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, তাহাদের হাতে একটি পুটুলিতে খাদ্য। তাহারা দেবমূর্ত্তির কাছে গিয়া তিন চার বার হাততালি দিল। সেই শব্দ শুনিয়া দেবমূর্ত্তির আড়াল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল

[নেপথ্যে] শ্যালক, শ্যালক !

বটুদ্বয়। প্রভু, বাইরে আসুন খাদ্য এনেছি।

তখন মূর্ত্তির পশ্চাৎ হইতে এক কৃশকায় বিরলবস্ত্র ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল ; তাহার নাম ক্ষপণক ; সে ওইখানে নির্জ্জনে বসিয়া তপস্যা করে ; কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেই হাত বাড়াইয়া ভদ্রার নৈবেদ্য হইতে সন্দেশ গ্রহণ করিয়াছিল

ক্ষপণক। শ্যালক, শ্যালক ! ওঃ, হাতপাগুলো অসাড় হয়ে গেছে, অতটুকু জায়গায় ব'সে থাকা বড়ই কষ্ট। ওহে, আমার হাতটা একটু টেনে দাও দেখি, দুজনে দু হাত।

দুই বটু দুই হাত, ক্রমে দুই পা টানিয়া দিল ; ক্ষপণক তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল

১ম বটু। প্রভু, খাদ্য এনেছি।

ক্ষপণক। খাদ্যে আজ আর প্রয়োজন নেই ; বাসুদেবের নৈবেদ্য থেকে যথেষ্ট গ্রহণ করেছি।

২য় বটু। আজ এত বেশি নৈবেদ্য দেখছি কেন ?

ক্ষপণক। বিপদকালে দেবতাকেই বেশি ক'রে মনে পড়ে। আজ বাসুদেবের ফলার।

২য় বটু। প্রভু, আপনার তপস্যা আর কতদিন চলবে ?

ক্ষপণক। তপস্যা আজ থেকে শেষ হ'ল।

১ম বটু। তবে সিদ্ধিলাভ হয়েছে ?

ক্ষপণক। এক রকম ! দেখ, কি জন্যে তপস্যা করছিলাম ? দেবত্ব লাভ করবার জন্যে তো ?

১ম বটু। তাই তো জানি।

ক্ষপণক। দেবতা হবার কি বিপদ, আজ তা বুঝতে পেরেছি।

২য় বটু। দেবতা হবার বিপদ?

ক্ষপণক। হ্যাঁ, আজ নিজের চোখে এবং কানে বাসুদেবের যে দারুণ সমস্যা দেখলাম তাতে আর দেবতা হবার লোভ আমার নেই।

২য় বটু। বাসুদেবের সমস্যা?

ক্ষপণক। তোমরা বালক, বুঝবে না। শোন, বুঝিয়ে বলি, আজ বাসুদেবের কাছে এত বিভিন্ন লোক এত পরস্পরাবরুদ্ধ প্রার্থনা জানিয়েছে যে বাসুদেবের পিতারও সাধ্য নেই তা পূর্ণ করেন।

১ম বটু। কি রকম প্রভু?

ক্ষপণক। দেখ না কেন, একদল প্রার্থনা করল যেন গোপালদেব নির্ব্বাচিত হন, আর একদল করল যেন গোপালদেবের নির্ব্বাচন না হয়; একজন করল যেন গোপালদেবকে হত্যা করা যায়, আর একদল করল যেন গোপালদেব চিরজয়ী হয়; আর একজন বাসুদেবের পিঠ চাপড়ে জানিয়ে দিলে, সে তার সমকক্ষ। ভাগ্যে বাসুদেব পাথরের! ওহে, দেবত্ব লাভের পণ ছেড়ে দিলাম, এবার অন্য পথ দেখতে হবে।

১ম বটু। অন্য পথ?

২য় বটু। জীবিকা অর্জ্জনের আর কি উপায় আছে, প্রভু?

১ম বটু। সন্ন্যাসে জীবিকা অর্জ্জনের বালাই নেই; কোন রকমে একটা কৌপীন সংগ্রহ করতে পারলেই অন্যের জীবিকায় আনন্দে ভাগ বসানো যায়।

২য় বটু। জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন পন্থা তো জানি না।

ক্ষপণক। তোমরা বালকমাত্র। শোন বৎস, জীবিকার সরলতম পথ আবিষ্কার করেছি, আমার সঙ্গে তোমরাও চল।

১ম বটু। কি পথ প্রভু?

ক্ষপণক। চিকিৎসাশাস্ত্র।

উভয়ে। চিকিৎসাশাস্ত্র! তার যে কিছুই জানি না।

ক্ষপণক। ওতে কিছু জানবার প্রয়োজন হয় না, জানলেই বরঞ্চ গোলমাল। আচ্ছা, তোমারা লেখাপড়া জান?

উভয়ে। আজ্ঞে না।

ক্ষপণক। রোগ কাকে বলে জান?

উভয়ে। আজ্ঞে না।

ক্ষপণক। ঔষধ কাকে বলে জান?

উভয়ে। আজ্ঞে না।

ক্ষপণক। চিকিৎসা কাকে বলে জান?

উভয়ে। আজ্ঞে না।

ক্ষপণক। জীবিতে আর মৃতে প্রভেদ কি জান?

উভয়ে। আজ্ঞে না।

ক্ষপণক। অর্থ কাকে বলে জান?

উভয়ে। আজ্ঞে, তা জানি বই কি।

ক্ষপণক। কে বলে তোমরা চিকিৎসক নও?—তোমরা একেবারে ধন্বন্তরির শিষ্য।

১ম বটু। আজ্ঞে, আমাদের মধ্যে এত যে গুণ ছিল, তা তো জানতাম না।

ক্ষপণক। বৎস, সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ আছে, কেবল গুরুর অভাবে তা জানতে পারা যায় না। শোন বৎস, চিকিৎসাশাস্ত্রের

মর্ম্মকথা বলি, রোগ আছে, রোগী আছে, কিন্তু চিকিৎসা ব'লে কোন শাস্ত্র নেই। রোগ হ'লে কতক বাঁচবে, কতক মরবে; চিকিৎসাতেও কতক বাঁচবে, কতক মরবে; কাজেই চিকিৎসা শেখবার কোন দরকার দেখি না, কেবল সাহস ক'রে গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। তবে পারতপক্ষে ঔষধ না দেওয়াই ভাল, তাতে মরবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় মাত্র।

উভয়ে। যে আজ্ঞা।

ক্ষপণক। দেখ নি, যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি ন্যায়শাস্ত্র জান? সে বলবে, জানি না। পূর্ত্তবিদ্যা জান? বলবে, জানি না। সাহিত্য জান? বলবে, জানি না। শিল্প জান, দর্শন জান, রন্ধনবিদ্যা জান, এমন কি চৌরবিদ্যা জান? বলবে, জানি না। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, চিকিৎসাবিদ্যা জান? অমনই বলবে, তা কিছু কিছু জানি বই কি!

উভয়ে। আজ্ঞে, তা দেখেছি।

ক্ষপণক। পৃথিবীতে যত লোক, তত চিকিৎসক। এ হেন বিদ্যা আবার কষ্ট ক'রে শিখতে হবে কেন?

উভয়ে। আজ্ঞে, এতক্ষণে বুঝলাম।

ক্ষপণক। বুঝবে বই কি বৎস, অনেক দিন যে আমার সঙ্গে আছ! তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, সর্ব্বদা চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল কথা কটি মনে রাখবে।—প্রথম, মানুষ অমর নয়; কাজেই মানুষ মরলে বিস্মিত না হয়ে দোষ তার ওপরে চাপিয়ে দেবে।

উভয়ে। আজ্ঞে, দেব।

ক্ষপণক। দ্বিতীয়, রোগ হ'লেই মানুষ মরে না; কাজেই বেঁচে উঠলে তার সমস্ত কৃতিত্ব নিজেরা গ্রহণ করবে।

উভয়ে। আজ্ঞে, করব।

ক্ষপণক। তৃতীয়, রোগের চেয়ে ওষুধেই মানুষ বেশি মরে,—এ রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

উভয়ে। আজ্ঞে, করব না।

ক্ষপণক। রোগীর বাড়িতে গিয়ে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে আগেই পারিশ্রমিক আদায় ক'রে নেবে।

উভয়ে। আজ্ঞে, তা নেব।

ক্ষপণক। নিজের ব্যাধি হ'লে কখনও চিকিৎসক ডাকবে না।

১ম বটু। আজ্ঞে, এত শোনবার পরে, ও প্রতিজ্ঞা নিতান্ত বাহুল্য।

ক্ষপণক। বৎস, তোমরা চিকিৎসক হয়ে গেছ। চল, এবার তিনজনে মিলে অসঙ্কোচে সগৌরবে গৌড়বাসীর ধনপ্রাণ বিনাশে লেগে পড়া যাক।

তিনজনের প্রস্থান

বাসুদেব-মূর্তি সব দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল

চ-দৃশ্য

কলিকাতা শহর; ১৯৩৭ সাল; সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ির বৈঠকখানা; বৈঠকখানা না বলিয়া ড্রয়িং-রুম বলিলে বোধ হয় বাড়ির লোকেরা খুশি হয়; সর্ব্বানন্দবাবু অবশ্য আর খুশি হইবার জন্য নাই, তিনি মৃত; তিনি ধনী ও প্রগতিবাদী ছিলেন, কাজেই দরিদ্র প্রগতিবাদীদের দুঃখ তাঁহাকে বুঝিতে হয় নাই; তিনি একমাত্র কন্যা সুভদ্রাকে শিক্ষিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন; ইংলণ্ডে সে বিশেষ কিছু শেখে নাই, তবে সে প্লাষ্টার অব প্যারিসে মূর্ত্তি তৈয়ারি করা শিখিয়া আসিয়াছে; দেশে ফিরিয়া সে অবসর সময় [কাজের অবসরে নয়, বিশ্রামের অবসরে] মূর্ত্তি গড়ে; পয়সার জন্য নয়, কাজেই সেগুলির ভালমন্দর প্রশ্ন ওঠে না; তৈয়ারি করিয়া হয় রাখিয়া দেয়, নয় বন্ধুবান্ধবদের দান করে; সংসারে অভিভাবিকা [যদি বিলাত-ফেরত মেয়ের অভিভাবিকা বলিয়া কিছু থাকে] তাহার বিমাতা জগদম্বা দেবী; সুভদ্রা বিলাত হইতে ফিরিলে সর্ব্বানন্দবাবুর মৃত্যু হয়; তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু মরিবার আগে তিনি এক অদ্ভুত উইল করিয়া গিয়াছেন; তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নাটকের উদ্ভব; তার স্থূল মর্ম্ম এই—সুভদ্রার বয়স একুশ বছর পূর্ণ হইলে সে বঙ্গীয়-আইন-সভার কোন সভ্যকে বিবাহ করিবে; অন্যথা করিলে, পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকা-কড়ি গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতি পাইবে।

সুভদ্রার বয়স প্রায় একুশ পূর্ণ হইবার মুখে—কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই; জগদম্বা দেবী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, উইলের নির্দ্দেশ মত বরও জুটিয়া উঠে নাই। এই উইলের কার্য্যকারক চক্রধরবাবু, সর্ব্বানন্দবাবুর পরিবারের উকিল।

সেদিন সকালে বৈঠকখানার দৃশ্য; দুই দিকে দুইটি প্রবেশের দ্বার; পিছনের দেয়ালে একটি দ্বার—বাড়ির ভিতরে যাইবার সোজা পথ; দেয়ালের কাছে একটা ঘূর্ণ্যমান শেলফে বই; তার উপরে একটি প্লাষ্টার অব প্যারিসের মূর্ত্তি, যে কোন নারী-মূর্ত্তি বলিয়া

চলিতে পারে; সুভদ্রার বিশ্বাস সেটা তার নিজের মূর্ত্তি—তবে তার নিজের রচনা, তাতে সন্দেহ নাই; রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের দিকে একখানি চেয়ারে সুভদ্রা বসিয়া ছোট একখানি টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্লাষ্টার দিয়া একটি মূর্ত্তি গড়িতেছে; অদূরে আর একখানি চেয়ারে কল্যাণবাবু তাস লইয়া আপন মনে ক্রমাগত ভাঁজিয়া যাইতেছেন—তাঁর সম্মুখে ছোট একখানি টেবিল; আশে পাশে আরও খানকতক চেয়ার—লোক আসিতে পারে, এই জন্য।

কল্যাণবাবু এঁদের দূরসম্পর্কিত আত্মীয়, বহুদিন এঁদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে এখন পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেকে বাক্-বাণিজ্যের রথ্‌চাইল্ড বলিয়া পরিচয় দেন; জীবনে কথা বলা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, যখন কথা বলেন না, তখন তাস লইয়া বসিয়া ভাঁজিতে থাকেন, কিম্বা তাসের নানা রকম ম্যাজিক দেখান—তাস তিনি কখনও খেলেন না।

সুভদ্রার বয়স এখন একুশের মুখে—তবে মেয়েদের বয়সের কোন মুখ্য প্রমাণ, অর্থাৎ যে প্রমাণ মুখে দেখা যায়, যেমন—দাড়ি, গোঁফ, না থাকায় যে যাহা খুশি বিশ্বাস করিতে পারেন; ছিপ ছিপে গড়ন; স্তাবকে বলিতে পারে তন্বী, নিন্দুকে বলিতে পারে রোগা; কবি বলিতে পারে—কন্দর্পের ফুলশরের মত লঘু, একাগ্র, চটুল: ভুক্তভোগী বলিতে পারে, তাতে ফুলশরের তীক্ষ্ণতা আছে কিনা; চুল আলগা করিয়া জড়ানো, খানিকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে; পিছন হইতে দেখিলে চুলের রাশি ও বডিসের মাঝখানে ঘাড়ের যে মনোরম অংশটুকু দৃষ্ট হয়, সেখানে সোনার হারের চকিত উজ্জ্বলতা; মুখে একজোড়া রিম-লেস চশমার কথা ছাড়িয়া দিলে অসামান্যতা আছে; এইসব মেয়েই অবস্থাচক্রে পড়িলে জোয়ান অব আর্ক হইতে পারে, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হইতে পারে, কিংবা বিলাসিনী রোমান সম্রাজ্ঞী হইতে পারে; আপাতত সে সুভদ্রা মাত্র। কক্ষের এক পাশে ত্রিপাদ কাষ্ঠ-টেবিলে একটি রেডিও-সেট

সুভদ্রা। কল্যাণবাবু, দয়া ক'রে দেখুন না ঘড়িতে ক-টা।

কল্যাণ। [দেয়ালের ঘড়ি দেখিয়া] তিনটে বাজতে পনেরো মিনিট।

সুভদ্রা। এ রকম ক'রে সবাই বলতে পারত; বাক্-বাণিজ্যের রথ্‌চাইল্ডের মুখে এমন সাধারণ কথা সাজে না।

কল্যাণ। তবে শুনুন, ঘড়ির দীর্ঘায়িত দুই কাঁটা দুই ডানা মেলে দিয়ে হুহু শব্দে কালের আকাশে উড়ে চলেছে।

সুভদ্রা। কিন্তু যখন দুই কাঁটা একত্র হয় ?

কল্যাণ। সে তো একবার রাত বারোটায়, একবার দিন বারোটায়। দিন বারোটায় ওরা দুই হাত জোড় ক'রে সূর্য্যকে, রাত বারোটায় চন্দ্রকে নমস্কার করে।

সুভদ্রা। কে বললে, রথ্‌চাইল্ডের ব্যবসা ফেল হয়েছে! আচ্ছা কল্যাণবাবু, আপনি তাস খেলায় কি আনন্দ পান ?

কল্যাণ। মূর্ত্তি তৈরি করায় আপনার কিসের আনন্দ ?

সুভদ্রা। সৃষ্টির আনন্দ।

কল্যাণ। আমিও তো সৃষ্টি কর্‌ছি।

সুভদ্রা। কি ?

কল্যাণ। তাসের ঘর।

সুভদ্রা। তাসের ঘর তো ক্ষণভঙ্গুর।

কল্যাণ। নইলে সৃষ্টি ক'রে সুখ কি ? গড়ছি আর ভাঙছি। আমি একসঙ্গে ব্রহ্মা আর মহেশ্বরকে অফিশিয়েট করছি।

সুভদ্রা। বিষ্ণু কেন বাদ পড়লেন ?

কল্যাণ। বিষ্ণু তো পালনকর্ত্তা। এই অরাজকতার যুগে সৃষ্টি আছে, ধ্বংস আছে, স্থিতি নেই। বিষ্ণু এখন 'অন লীভ'।

সুভদ্রা। [হাতের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়া] নাকটা দেখছেন ?

কল্যাণ। দেখছি বই কি! স্পর্দ্ধিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের মত উঁচু হ'তে হ'তে হঠাৎ থেমে গেছে।

সুভদ্রা। আচ্ছা কল্যাণবাবু, কতগুলো চুনের গুঁড়ো দিয়ে এমন সৃষ্টি—একি যাদুবিদ্যা নয় ?

কল্যাণ। যাদু বই কি! সামান্য বস্তু যাতে অসামান্য হয়ে ওঠে, সেই তো যাদুবিদ্যা।

সুভদ্রা। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনার তাসে এমন যাদু নেই।

কল্যাণ। এত নিশ্চিত হলেন কি ক'রে?

সুভদ্রা। দেখি নি তো কখনও।

কল্যাণ। আচ্ছা, তবে দেখুন। [তাসগুলি পর পর সুভদ্রাকে দেখাইতে দেখাইতে] এর মধ্যে থেকে একখানা তাস মনে করুন! দেখুন, ভুল ক'রে বসবেন না! হয়েছে, হয়েছে?

সুভদ্রা। মনে ক'রেছি।

কল্যাণ। বলব—আপনি কি মনে ক'রেছেন? [তাস হইতে একখানা বাছিয়া লইয়া] এই নিন, এইখানা— হরতনের টেক্কা।

সুভদ্রা। মা গো! ঠিক হয়েছে, কি ক'রে বললেন?

কল্যাণ। যাদুবিদ্যা।

সুভদ্রা। আর একটা কিছু দেখান!

কল্যাণ। আচ্ছা দেখুন, এই নিন তাসগুলো, দেখুন—এর মধ্যে হরতনের টেক্কাখানা আছে কিনা!

সুভদ্রা তাস লইয়া দেখিল

সুভদ্রা। আছে।

কল্যাণ। আচ্ছা, এইবার আমার হাতের দিকে লক্ষ্য রাখবেন; আমি যাতে সরিয়ে ফেলতে না পারি। [তাস ভাঁজিতে ভাঁজিতে] আচ্ছা, এইবার দেখুন তো হরতনের টেক্কা আছে কি না!

সুভদ্রা তাস লইয়া দেখিল

সুভদ্রা। কোথায় গেল? নেই তো!

কল্যাণ। আমি বলছি, আপনি নিয়েছেন।

সুভদ্রা। আমি কখন নিলাম ?—কখ্খনো না !

কল্যাণ। নিশ্চয়।

সুভদ্রা। নিশ্চয়-ই নয় ! বাজি রাখতে পারি।

কল্যাণ। রাখবেন না, হারবেন। আমি বলছি—আপনি নিয়ে আপনার জামার মধ্যে পিঠের দিকে রেখেছেন। যান, ও ঘরে গিয়ে দেখে আসুন।

সুভদ্রার দ্রুত প্রস্থান ; কল্যাণ বসিয়া নীরবে তাস ভাজিতে লাগিল ; সুভদ্রার বিস্মিত-আনন্দে ছুটিয়া প্রবেশ

সুভদ্রা। কল্যাণবাবু, এই যে পেয়েছি ; আপনি সত্যি অদ্ভুত।

কল্যাণ। তাস জিনিসটাই অদ্ভুত।

পাশের দরজা দিয়া বয়-ভৃত্যের প্রবেশ এবং সুভদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া

ভৃত্য। সাহেব এসেছেন।

সুভদ্রা। তাঁকে বসাও গে, আমি যাচ্ছি।

ভৃত্যের প্রস্থান

কল্যাণ। কে, হলধরবাবু নাকি ?

সুভদ্রা। মিঃ রায়ের আবার ও নাম হ'ল কবে থেকে ?

কল্যাণ। যে দিন থেকে লাঙল ধ'রে ইলেক্শনে নেমেছেন।

সুভদ্রা। আপনি বসুন, আমি আসছি,—বেশি দেরি হবে না।

সুভদ্রার প্রস্থান, কল্যাণবাবুর তাস লইয়া স্বমনোরঞ্জন।

জগদম্বা দেবী ও উকিল চক্রধরবাবুর প্রবেশ। জগদম্বা দেবী স্থূলকায়া, অতি অল্পেই ব্যস্ত হইয়া পড়েন ; সধবা থাকিতে সর্ব্বদা একটি বৃহৎ পানের বাটা হস্তে করিয়া বেড়াইতেন ; এখন পান খাইবার উপায় নাই, তাই একটি সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জামের বাক্স হাতে করিয়া বেড়াইয়া পূর্ব্ব অভ্যাসের ভারকেন্দ্র রক্ষা করেন। চক্রধরবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছে ; কৃশ, দীর্ঘ ; যে ভার তিনি বহন করিতেছেন তার বিরক্তির চিহ্ন মুখে সর্ব্বদা দৃশ্যমান

জগদম্বা। এই যে বাবা কল্যাণ, আমি তো পারি না, তুমি যা হয় কর।

কল্যাণ। আপনি বসুন খুড়িমা, ব্যস্ত হবেন না; ব্যাপার কি চক্রধরবাবু?

জগদম্বা। ব্যস্ত হব না, বল কি? মেয়ের বয়স কত হ'ল, খোঁজ রাখ কি?

কল্যাণ। আজ্ঞে, ঠিক বলতে পারব না, তবে এ নিশ্চয় যে, কাল যত ছিল, আজ তার চেয়ে এক দিন বেশি।

চক্রধর। এক দিন এক দিন ক'রে একুশ বছর হ'তে কি বেশি সময় লাগে?

জগদম্বা। তুমি তো বলছ বাবা, ব্যস্ত হব না; কিন্তু লোকে বলবে কি? বলবে, সুভো আমার নিজের মেয়ে নয় ব'লে, আমার কোন দায়িত্ব নেই।

চক্রধর। আর আমাকেই বা কি বলবে? বলবে যে, সর্ব্বানন্দবাবুর বন্ধু হয়ে আমি উইলের নির্দ্দেশ মত বিয়ে না দিয়ে, বাপের সম্পত্তি থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করবার কারণ হলাম।

জগদম্বা। আমি বলছি উকিলবাবু, শেষ সময়ে ওঁর মাথার ঠিক ছিল না, নইলে ওরকম উইল কেউ করে? নিজের মেয়ে সম্পত্তি পাবে না, পাবে কোন গুড়ের কারবার?

চক্রধর। গুড়ের কারবার নয়; গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব-গবেষণা সমিতি।

জগদম্বা। ওই, একই কথা। তুমি কি বল বাবা?

কল্যাণ। আজ্ঞে, আমাকে আর বলতে দিলেন কই! যা বলবার আপনারাই তো বলছেন!

চক্রধর। যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন; সুভদ্রার একুশ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে আমি আর এ সম্পত্তি বাঁচাতে পারব না,—উকিল হয়ে আইন লঙ্ঘন আমার দ্বারা হবে না।

কল্যাণ। আজ্ঞে না, আপনারা আইন লঙ্ঘন করেন না জানি, যারা করে তাদের পরামর্শ দেন মাত্র। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ আপনারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

জগদম্বা। আজ সকালে! তুমি যে কি বল, তার ঠিক নেই! আমি সেই ছ বছর আগে কর্ত্তাকে বলেছিলাম, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেল। তিনি বললেন, বর কই? আমি বললাম, কেন, ওই যে শ্রীমন্ত রয়েছে! তিনি শুনে বার কয়েক নস্যি নিলেন। বল তো বাবা, এটা কি উচিত হয়েছিল?

কল্যাণ। কোন্‌টার কথা বলছেন? নস্য নেওয়া, না, উত্তর না দেওয়া?

জগদম্বা। আমি কি করব? কর্ত্তা গেলেন স্বর্গে, শ্রীমন্ত গেল বিলেতে।

কল্যাণ। আপনিও তো সুভদ্রাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন!

জগদম্বা। আমি পাঠিয়েছিলাম? মাগো মা! [তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন] কর্ত্তার কি ঝোঁক হ'ল—বিলেত না গেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখবে না। আহা-হা, কি বিদ্যাই না শিখে এসেছে!—পুতুল তৈরি করা! কেবল টাকার শ্রাদ্ধ!

চক্রধর। শ্রীমন্ত ছেলেটি ছিল ভাল।

জগদম্বা। ভাল হ'লে কি হবে? সে যে সেই বিলেতে গিয়েছে, সে আজ ছ সাত বছর হ'ল, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত নেই। ফিরলেই বা কি হ'ত, অমনি তো বিয়ে হ'ত না; তাকে আবার—ওকে কি ব'লে বাবা?

কল্যাণ। ইলেক্‌শন।

জগদম্বা। হাঁ, সেই—তা-ই করতে হ'ত।

কল্যাণ। কিন্তু মণিময়বাবু তো আছেন। আমার তো মনে হয়, তাঁর প্রতি সুভদ্রা বিরূপ নয়।

জগদম্বা। হ'লে কি হয়! তাকে তো অবার সেই—কি ব'লে ওকে বাবা?

কল্যাণ। ইলেক্‌শন।

জগদম্বা। হ্যাঁ, তা ই করতে হবে।

কল্যাণ। সে আপনি সন্দেহ করবেন না।। তিনি যে রকম ভাবে লাঙল ধরেছেন, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবেন।

জগদম্বা। কিন্তু তারও তো আজ তিন দিন দেখা নেই!

কল্যাণ। তিনি এসেছেন, সুভদ্রা এইমাত্র গেল।

জগদম্বা। [উঠিয়া] উকিলবাবু, চলুন, কি বলে সে, শোনা যাক! চল বাবা কল্যাণ, তুমও।

কল্যাণ। আমি না হয় না-ই গেলাম।

জগদম্বা। না না, তুমি না গেলে হবে না, চল।

কল্যাণ। চলুন।

তিন জনের পাশের দ্বার দিয়া প্রস্থান ;

পিছনের দ্বার দিয়া মণিময় রায় ও সুভদ্রার প্রবেশ ; মণিময়বাবুর বয়স ত্রিশের কাছে; সমস্ত দেহটাকে একটা সুদৃঢ় সুপুষ্ট মাংশ-পেশী বলিলেই চলে ; মাথার সম্মুখে সামান্য একটু টাকের আভাস ; মণিময়বাবু সেটাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন ; বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই তার চর্চ্চা করিয়াছেন ; বঙ্গীয়-আইন-পরিষদের নির্ব্বাচনে নামিয়াছেন, খদ্দরের ধুতি ও খদ্দরের মোটা কোর্ত্তা গায়ে ; বুকের কাছে কোটের উপরে লাল সুতায় একটি লাঙ্গল অঙ্কিত ; ইলেক্‌শন-সমুদ্রে ইহাই তাঁর ট্রেড-মার্ক

মণিময়। সুভদ্রা দেবী, যে নামে আপনাকে সবাই ডাকে সে নামে আমি আপনাকে ডাকতে চাই না ; কিন্তু বিপদ এই যে, আপনার কোন ডাক-নাম নেই।

সুভদ্রা। দক্ষিণা বাতাসেরও তো কোন ডাক-নাম নেই, মিঃ রায়। এই দেখুন, আমি কেমন মূর্ত্তি তৈরি করেছি।

মণিময়। আমিও তো তাই দেখছি।

সুভদ্রা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

মণিময়। আর কোথায় দেখব?

সুভদ্রা। কি যে বলেন! আমি বলছি আমার তৈরী মূর্ত্তির কথা।

মণিময়। এতক্ষণ চোখে পড়ে নি—ওটাও কম সুন্দর নয়! সুভদ্রা দেবী, আপনার বাড়িতে ঘর অনেক, লোক তার চাইতেও বেশি, একটু নির্জ্জন পাবার উপায় নেই।

সুভদ্রা। [অপ্রস্তুতভাবে] কেন?

মণিময়। দুটো কথা আপনাকে বলব।

সুভদ্রা। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে?

মণিময়। [ইতস্তত করিয়া] হাঁ, এক রকম নির্ব্বাচনই বলতে পারেন।

সুভদ্রা। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আপনার কি সন্দেহ আছে নাকি?

মণিময়। আছে বই কি!

সুভদ্রা। লোকের মনোভাব কি?

মণিময়। সেই কথা জানতেই তো এসেছি।

সুভদ্রা। কোথায়?

মণিময়। যাঁর হাতে নির্ব্বাচনের ভার আছে।

সুভদ্রা। আমি লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লির কথা বলছি।

মণিময়। আজ্ঞে, আমি সে কথা বলছি না।

সুভদ্রা। আজ বেশ একটু গরম পড়েছে।

মণিময়। দেখুন না, আমি একেবারে ঘেমে উঠেছি।

সুভদ্রা। ঘামবার মত গরম পড়ে নি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

মণিময়। আজ্ঞে, সে কথা আর বলতে!—হৃদয় আমার জমে যাবার মত হয়েছে!

সুভদ্রা। ঠাণ্ডায় ?

মণিময়। আজ্ঞে না, ভয়ে।

সুভদ্রা। ওই যে ওঁরা আসছেন !

মণিময়। কি বিপদেই পড়লাম !

যে দ্বার দিয়া গিয়াছিল, সেই দ্বারপথে তিনজনের প্রবেশ

জগদম্বা। সুভদ্রা, তোমাদের খুঁজতে গিয়েছিলাম বড় বৈঠকখানায়।

সুভাদ্রা। মা, সেখানেই ছিলাম এতক্ষণ। মণিময়বাবু আমার তৈরি মূর্ত্তি দেখতে চাইলেন, তাঁকে নিয়ে এইমাত্র এসেছি।

কল্যাণ। কি রকম দেখছেন মণিময়বাবু ?

মণিময়। মার্ভেলাস ! এমনটি কোথাও দেখি নি।

চক্রধর। আপনার ইলেক্‌শনের গতিক কি রকম ?

মণিময়। কেন, খবরের কাগজে দেখেন নি ? আমার বিরুদ্ধে তিন জন দাঁড়িয়েছিলেন, কালকে দু জন স'রে দাঁড়িয়েছেন।

চক্রধর। হঠাৎ ?

মণিময়। হঠাৎ নয়, ভাব গতিক ভাল নয় বুঝে।

চক্রধর। আর একজন যে আছে বললেন ?

মণিময়। তাঁর অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

চক্রধর। কেন ?

মণিময়। গোড়'তেই তিনি ভুল ক'রে বসেছেন ! তিনি ট্রেড-মার্ক নিয়েছেন—একখানা হাত। তিনি বক্তৃতায় ব'লে বেড়াচ্ছেন, এই হাত হচ্ছে শক্তির প্রতীক, সাহায্যের প্রতীক, দানের প্রতীক ; অতএব এস সবাই—আমাকে ভোট দাও !

আর আমরা ব'লে বেড়াচ্ছি [বক্তৃতার ভঙ্গিতে] ওই হাত হচ্ছে সেই হাত, যাতে লাঠি ধৃত হবে ; ওই হাত হচ্ছে সেই হাত,

যাতে ট্যাক্স সংগৃহীত হবে ; কারণ সংস্কৃত ভাষায় কর মানেই ট্যাক্স ; ওই হাত হচ্ছে রাজার হস্ত, যার সম্বন্ধে বিশ্বকবি বলেছেন—'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি !' শুনেই সব নির্ব্বাচকের দল স'রে পড়ছে। আমার ছাড়া আর কারও আশা নেই।

কল্যাণ। আর আপনার ট্রেড-মার্কা এই লাঙল সম্বন্ধে কি রকম বলছেন ?

মণিময়। শুনবেন তবে ? শুনুন ! আমি বলতে আরম্ভ করি—[বক্তৃতার ভঙ্গিতে] ভাই চাষা ! আমি চাষা—তাই আজ লাঙল ধরেছি ! না, আমি চাষারও অধম, আমি মানুষেরও অধম, আমি স্বয়ং গরু, তাই আমি লাঙল টানছি।

বুঝলেন কল্যাণবাবু, এই কথা শুনে চাষার দল জিগির দিয়ে ওঠে।

কল্যাণ। উঠবেই তো, চাষার মত কথা কি না !

মণিময়। তারপরে শুনুন ! [বক্তৃতার ভঙ্গিতে] আমি তোমাদের জন্যে কি ক'রব, চাষা ভাই, জান ? জমিদারের খাজনা তুলে দেব ; প্রত্যেককে লাঙল গড়িয়ে দেব ; মহাজনের দেনা মাপ ক'রে দেব ; নদী কাটিয়ে দেব ; বিনা পয়সায় ডাল-ভাতের জোগাড় ক'রে দেব !

তারপরে সুর একটু চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করি—তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না ? হাঁ, নিশ্চয় পাচ্ছ না ; কান যে বধির হয়ে গিয়েছে, তাই শুনতে পাচ্ছ না ! আমি দিন রাত শুনছি,—আকাশে বাতাসে, মাঠে ঘাটে, জলে স্থলে, শহরে গ্রামে,—আর্ত্ত চীৎকার—ময় ভূখাঁ হুঁ।

সুভদ্রা। আপনি নির্ব্বাচিত হ'লে এ সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন ?

মণিময়। কি যে বলছেন—তার ঠিক নেই! একে বলে—রাজনীতি!

সুভদ্রা। তার মানে?

কল্যাণ। তার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথামালার সেই রাখালের গল্প মনে আছে? গরুর পালে বাঘ পড়েছে ব'লে যে চীৎকার করেছিল? প্রথম দুদিন মাঠের চাষার দল—বাঘ পড়েছে শুনে ছুটে গিয়েছিল, তৃতীয় দিনে আর যায় নি। কিন্তু এই চাষার দল, যারা মণিময়বাবুর নির্ব্বাচক, প্রত্যেক দিন বাঘ পড়েছে চীৎকার শুনে ছুটে যায়, প্রত্যেক দিন দেখে, সেটা মিথ্যা; তবু তাদের হুঁস হয় না।

জগদম্বা। সুভদ্রা, তুমি একবার ভাঁড়ারের দিকে যাও তো মা! কেউ না থাকলে ওরা সব চুরি ক'রে শেষ ক'রে দেবে।

সুভদ্রার প্রস্থান

বাবা মণিময়, তোমাকে একটা কথা বলব।

মণিময়। আজ্ঞা করুন!

জগদম্বা। তোমার যখন সেই—ওটা কি ব'লে বাবা?

কল্যাণ। ইলেক্‌শন।

জগদম্বা। হাঁ, সেটা এক রকম ঠিক। জান তো বাবা, কর্ত্তার খামখেয়ালী উইলের কথা?

মণিময়। কিছু কিছু শুনেছি।

চক্রধর। তবে একবার ভাল ক'রে শুনুন; সুভদ্রার একুশ বছর পূর্ণ হ'লে আইন-পরিষদের কোন সদস্যকে বিয়ে করতে হবে; নইলে সর্ব্বানন্দবাবুর সব টাকা কড়ি সম্পত্তি যাবে গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা সমিতিতে।

জগদম্বা। আমরা এখন চিন্তায় পড়েছি—আজকালকার দিনে ভদ্র শিক্ষিত পাত্র পাওয়াই মুস্কিল!

মণিময়। আজ্ঞে, আমি যে নিজেকে চাষা বললাম, সেটা কিন্তু সত্যি নয়।

কল্যাণ। তা জানি, ওর কোনটাই সত্যি নয়।

জগদম্বা। তোমার যদি বাবা, আপত্তি না থাকে, যদি সুভোকে বিয়ে কর, তবে—

মণিময়। আজ্ঞে, আর বলতে হবে না—আমার স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য, আমি আর কি বলব?

ভাবাতিশয্যে সে হঠাৎ জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া ফেলিল

জগদম্বা। [চক্রধরের প্রতি] উকিলবাবু, একটা দিন ঠিক করলে হ'ত না।

চক্রধর। কথা হ'য়ে রইল—ইলেক্‌শন হ'য়ে গেলেই। কি বলেন মণিময়বাবু?

মণিময়। আজ্ঞে, আপনারা যেমন আদেশ করবেন।

সুভদ্রার একখানা খামের চিঠি লইয়া প্রবেশ

সুভদ্রা। মা, তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, খুলব নাকি?

জগদম্বা। চিঠি? ডাকে এল নাকি?

সুভদ্রা। না, লোকে নিয়ে এসেছে।

জগদম্বা। দেখ তো বাপু, কি দুঃসংবাদ এল আবার!

সুভদ্রা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল

ইংরাজীতে বুঝি? কে লিখেছে? ও কি! ও কি! অমন ক'রে চললে কোথায়?

সুভদ্রার চিঠি ফেলিয়া পলায়ন

জগদম্বা। দেখ তো বাবা কল্যাণ, কি সংবাদ এল আবার ?

কল্যাণ। [চিঠি পড়িয়া] খুড়িমা, শ্রীমন্ত কালকে দেশে ফিরেছে ; সে আজকে সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে আসবে, তাই একটু আগে চিঠি লিখে জানিয়েছে।

চক্রধরবাবু, জগদম্বা, কল্যাণ তিনজন এই নূতন সূচনায় হতভম্ব ; মণিময় ভীত হইয়া উঠিল

মণিময়। আজ্ঞে, আপনারা সবাই এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কেন ? শ্রীমন্ত কে ? পাওনাদার নাকি ?

কল্যাণ। বোধ হয় ; তার পাওনা আদায় করতেই আসছে।

মণিময়। তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার, চক্রধরবাবু। হ্যাণ্ডনোট, বন্ধকী খত, না কি ?

কল্যাণ। না, মানুষ জামিন আছে।

জগদম্বা। উকিলবাবু, এখন কি করি বলুন তো ? আমি তো মেয়েমানুষ, কি বলেন ? তবে আমার উপরে এত হাঙ্গামা কেন ?

কল্যাণ। আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন, খুড়িমা !—শ্রীমন্ত এলে ভয়টা কিসের ?

মণিময়। ভয় নয়, বলেন কি ? কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ পাওনাদার আসা ! নাঃ, এ অসম্ভব !

জগদম্বা। তুমি সে বুঝবে না বাবা।

কল্যাণ। আপনি থামুন মণিময়বাবু। খুড়িমা, আপনি ও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, ব্যস্ত হয়ে শরীর খারাপ করবেন না।

জগদম্বা। এখন মরণ হ'লেই বাঁচি। কোন রকমে কাজটা একটু গুছিয়ে এনেছি—এমন সময়ে এক বিঘ্ন ! যে একগুঁয়ে মেয়ে, ঘুরে বসলে সব মাটি হয়ে যাবে !

কল্যাণ। আচ্ছা, তার তো দেরি আছে—আমরা দেখছি।

জগদম্বা। তুমি তো সব তাতেই দেরি দেখছ? এদিকে যে একুশ বছর হ'তে চ'ল্‌ল!

মণিময়। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কল্যাণ। সব বুঝিয়ে দেব, একটু অপেক্ষা করুন। খুড়িমা, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

জগদম্বা। আর বিশ্রাম! এখন মরণ হ'লেই বাঁচি।

প্রস্থান

মণিময়। কল্যাণবাবু, আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

কল্যাণ। কেন?

মণিময়। ঠিক নাকের উপরে এক ঘুসি দেব।

কল্যাণ। কার?

মণিময়। ওই যে, কে আসছে, তার—

কল্যাণ। কেন?

মণিময়। এমন অসময়ে পাওনা আদায় করতে আসছে।

কল্যাণ। ওখানে চুপ ক'রে বসুন তো!

চক্রধর। কল্যাণবাবু, যে যা বলুক না কেন, আমি কিন্তু উইলের সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ ক'রব।

কল্যাণ। কে আপনাকে নিষেধ ক'রছে?

মণিময়। এখনও বুঝতে পারছি না, কিন্তু সে যে-ই হোক না কেন—

এমন সময়ে বাড়ির বাহিরে মোটরের শব্দ হইল

কল্যাণ। ওই বোধ হয় এল!

মণিময়। কল্যাণবাবু, আমি যাই তা হ'লে! এক ঘুসির বেশি দরকার হবে না—কলেজে আমি চ্যাম্পিয়ান বক্সার ছিলাম।

কল্যাণ। ওইখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকুন।

মণিময়। আপনি বলছেন—ব'সছি, কিন্তু সুভদ্রা দেবীর কোন অপমান হ'লে আমি সহ্য করতে পারব না কিন্তু! দেখবেন, তখনি কিন্তু ঘুসি চ'লে যাবে রে—

এমন সময়ে শ্রীমন্ত চাটুজ্জে প্রবেশ করিল; সুদর্শন যুবক, চুলগুলি উল্টা করিয়া বিন্যস্ত; ছিপছিপে চেহারা; পরণে সাহেবী পোষাক; ঐকান্তিক আত্মপ্রত্যয় তার চোখে মুখে; হাতে একটি কেরোসিন কাঠের ছোট বাক্স—নেহাৎ ছোট নয়, ধরুন, ২´×৩´×১´ ফুট; একদিকে তার একটি হাতল; হাতলটি ধরিয়া আছে। বাক্সটির চারদিকে গোলাকার বৃহৎ সীল-মোহরের চিহ্ন—ইংরেজী ভাষায় কি লেখা আছে অস্পষ্ট বলিয়া পড়া যায় না। সে ঘরে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইয়া প্রথমে মণিময়কে দেখিল, চিনিতে পারিল না; তারপরে কল্যাণ ও চক্রধরবাবুকে দেখিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল

শ্রীমন্ত। হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো! কল্যাণ যে! চক্রধরবাবু যে! আমি তো ভেবেছিলাম, বাড়ির ইট চৌকাঠ ছাড়া আর কোন পরিচিত দৃশ্য দেখতে পাব না।

কল্যাণ। এস এস, তারপরে ভাল তো?

চক্রধর। ভাল ছিলেন, শ্রীমন্তবাবু?

শ্রীমন্ত। আজ্ঞে, ভাল ছিলাম, মন্দ ছিলাম, নানা রকম ছিলাম। এখন ভালই আছি।

কল্যাণ। ব'স হে। তারপরে ওঃ, কতদিন পরে দেখা, বল তো!

শ্রীমন্ত। [হঠাৎ তাসের গুচ্ছ দেখিয়া] ঠিক তেমনি আছ হে! এখনও তাসের মায়া ছাড়তে পার নি?

কল্যাণ। বল কি হে? যতই দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি, তাস ছাড়া আর সবই মায়া।

মণিময়। কুঁড়ের খেলা।

কল্যাণ। সে জন্যই তো এর আদর—ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং কুঁড়ের বাদশা!

মণিময়। তাসের সঙ্গে আর ভগবানকে জড়াবেন না।

কল্যাণ। জড়াতাম না, যদি না তিনি নিজে জড়িয়ে থাকতেন।

মণিময়। কি রকম?

কল্যাণ। আমার ভগবান সম্বন্ধে ধারণা কি রকম জানেন? তিনি হচ্ছেন তাসের সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান।

মণিময়বাবু হাঁ করিয়া রহিলেন

তাসের খেলা যে দেখায়, সে কি করে? দর্শকদের বুদ্ধিকে জোর ক'রে নিজের বুদ্ধির সঙ্গে সমসূত্রে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়—এই তো! ভগবানও তো তাই ক'রছেন। মানুষকে, কি ব্যক্তি-গত ভাবে, কি জাতিগত ভাবে, নিজের ইচ্ছার মুখোমুখী দাঁড় করাচ্ছেন। যে মানুষ, যে জাতি ঠিক ভাবে এ নির্দেশ গ্রহণ ক'রতে পারল না—সে হতভাগ্য। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে তার চির বিদায়।

মণিময়। দেখুন, এখন আমি প্রগতিবাদী; গত মাসের সাত তারিখ ভোর সাতটা থেকে ভগবানে অবিশ্বাস করতে শুরু ক'রেছি, কাজেই তার নিন্দেয় আমার কিছু আসে যায় না; তবু ব'লব—ভগবানের এত বড় নিন্দে কেউ ক'রতে পারত না।

কল্যাণ। নিন্দে করি—এ থেকেই তো বোঝা উচিত যে, আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি। আর এ তে নিন্দে নয়।

মণিময়। নিন্দে নয়? বলেন কি, তাকে প্রকারান্তরে জুয়া খেলোয়াড় ব'ললেন।

কল্যাণ। জুয়া খেলোয়াড় বই কি! এক এক বারে কোটি কোটি গ্রহ সূর্য্যের ঘুটি চেলে নিজের সঙ্গে তার জুয়াখেলা চ'লছে।

শ্রীমন্ত। ওহে কল্যাণ, তোমার রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়ে ভর্ত্তি হওয়া উচিত ছিল, তা হ'লে জীবনে উন্নতি ক'রতে পারতে।

কল্যাণ। কেন?

শ্রীমন্ত। কেন কি? শব্দ-শক্তির মহিমা কীর্ত্তন রাষ্ট্রসঙ্ঘের একমাত্র কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আমরা এখনও পিছে প'ড়ে আছি; এবার দেখে এস গিয়ে, ওরা কি রকম শুধু কথায় রাজনৈতিক চিঁড়ে ভেজাচ্ছে। সারা ইউরোপ জুড়ে তাতে ফলার চ'লছে।

কল্যাণ। তুমি গিয়েছিলে নাকি?

শ্রীমন্ত। যাই নি? তবে এসব কথা শিখলাম কোত্থেকে?

কল্যাণ। আমাদের তো ধারণা ছিল, তুমি গিয়েছিলে ইংলণ্ডে।

শ্রীমন্ত। ইংলণ্ড থেকে আমাকে স্কলারশিপ দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠিয়েছিল।

কল্যাণ। স্কলারশিপ দিয়ে? খুলে বল।

শ্রীমন্ত। তা হ'লে উঠে দাঁড়াতে হ'ল।

কল্যাণ। আবার দাঁড়াতে যাবে কেন?

শ্রীমন্ত। শুধু দাঁড়ালে চ'লবে না, এই বাক্সটার উপরে উঠে দাঁড়াতে হবে।

কল্যাণ। ওটা আবার কি?

শ্রীমন্ত। ওর বাইরের পরিচয় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স মাত্র। ভিতরের পরিচয় হ'চ্ছে—ওটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডিপ্লোমা। রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমি দু বছর শিক্ষানবীশ ছিলাম। কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলে প্রেসিডেন্ট আমাকে এই বাক্সটি দিয়ে বললেন—বৎস, যাও, এই

বাক্স নিয়ে ভারতবর্ষে। যখনি কিছু বলবার দরকার হবে, এর উপরে উঠে দাঁড়াবে— অমনি তোমার মুখে স্বয়ং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সরস্বতী এসে আবির্ভূত হবেন। বুঝলে হে কল্যাণ? এটা হচ্ছে আমার বত্রিশ সিংহাসন, এর উপরে উঠে দাঁড়ালে স্বয়ং বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধি এসে মাথায় ভর করে।

কল্যাণ। এবার বল তা হ'লে, তোমার ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা।

শ্রীমন্ত কেরাসিন কাঠের বাক্সটার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল

শ্রীমন্ত। ইংলণ্ডে পৌঁছে এক বছরের মধ্যেই সব টাকাকড়ি গেল ফুরিয়ে। প্রথমে যে সব বন্ধুবান্ধব জুটেছিল, তারা সব পড়ল স'রে, এ বিষয়ে দেখলাম এদেশে আর ওদেশে কোন তফাৎ নেই। একদিন পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মাত্র আড়াই শিলিং পুঁজি। বসে পড়লাম একেবারে চেয়ারিং ক্রসের মোড়ে। সর্ব্বনাশ, কি করা যায়! ভাবতে ভাবতে মাথায় এল এক বুদ্ধি। গেলাম টেম্‌স নদীর ধারে জাহাজ-ঘাটে। এক খালাসীকে ওই আড়াই শিলিং ঘুষ দিয়ে—এ বিষয়েও দেখলাম এদেশে আর ওদেশে কোন তফাৎ নেই—যাক, তাকে ঘুষ দিয়ে জাহাজের মাস্তলের উপর উঠে গেলাম।

সকলে সমস্বরে। জাহাজের মাস্তলের উপরে?

শ্রীমন্ত। হাঁ, একেবারে জাহাজের মাস্তলের উপরে। থাকলাম সেখানে ব'সে। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন—ক্রমে ভিড় জমতে লাগল, দলে দলে লোক আসতে লাগল; খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসে আমার বাণী চাইতে লাগল; প্রত্যেক বাণী আড়াই শিলিং দরে বেচতে লাগলাম। ক্রমে ক্যামেরাধারীর দল এসে আমার ছবি

নিতে লাগল। এমনি ক'রে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ আলোচ্য ব্যক্তি হ'য়ে উঠলাম। তারপরে সারা ইউরোপে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদদাতাদের সে কি সব হেড লাইন—কেউ লিখল, The great Indian yogi! কেউ লিখল, Napoleon of the mast! কেউ লিখল, High thinking plain living incarnate! শেষে যখন বেরুল The second coming of Christ, কিন্তু not in the manager but on the mast, তখন স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রাইম-মিনিষ্টার বল্‌ডুইন জাহাজ-ঘাটায় এসে টুপি নেড়ে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে—Come down Indian yogi! আমি নেমে এলাম। তারপরে সে কি আদর-অভ্যর্থনা! এক সপ্তাহের জন্য আমাকে নিয়ে ইংলণ্ডের সে কি মাতামাতি! তারা ভুলেই গেল যে, আমরা তাদের অধীন প্রজা মাত্র। বড় বড় সব কন্‌জার্ভেটিভ কাগজে লিখলে—ভারতবর্ষে যদি অন্তত আর দশ জন এ রকম মাস্তুলে-চড়া প্রডিজি থাকে, তবে এদের স্বরাজ না দেওয়া একান্ত অন্যায়।

তখন বল্‌ডুইন আমাকে বললে—তোমার মত এমন উচ্চগামী প্রতিভা নষ্ট হওয়া উচিত নয়, যাও তুমি স্কলারশিপ নিয়ে লীগ অব নেশান্‌স-এ; তারা এই রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকই চায়। বুঝলে কল্যাণ, সেখানে দু'বছর ছিলাম শিক্ষানবিশ।

কল্যাণ। তারপর?

শ্রীমন্ত। কিছুকাল ইউরোপে ঘুরে বেড়ালাম।

কল্যাণ। কোন নূতন পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রলে?

শ্রীমন্ত। আভিধানিক পরিবর্তনটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল।

মণিময়। আভিধানিক পরিবর্তন?

শ্রীমন্ত। ইউরোপীয় অভিধানের কতকগুলি যে অর্থ আমরা জানতাম, আর তাদের সে অর্থ নেই।

মণিময়। কি রকম?

শ্রীমন্ত। যেমন ধরুন, ওদেশে এখন যুদ্ধের নাম—শান্তি-রক্ষা; অন্যের দেশ অধিকারের নাম—সভ্যতা-প্রচার।

কল্যাণ। যাই হোক. ও দেশে গিয়ে তুমি তা হ'লে খুব নাম ক'রেছ?

শ্রীমন্ত। ক'রব না! ও দেশে মহত্ত্বের দ্বার অজস্র এবং অবারিত। ভাল ফুটবল খেলতে পারলে তুমি গ্রেটম্যান; অনেক দিন ক্রমাগত সাঁতার কেটে থাকতে পারলে তুমি গ্রেটম্যান; একটা শাবল পুঁতে তার উপরে দু দিন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক, দেখবে—তুমি গ্রেটম্যান।

মণিময়। ওঃ, ওরা কত প্রগতিবাদী!

শ্রীমন্ত। শুধু কি তাই! তুমি খানকতক সাবান খেয়ে ফেল, দেখবে তার পরের দিন তুমি গ্রেটম্যান। ও দেশে গ্রেটম্যানের দর আজ কাল টাকায় দেড় ৮জন।

মণিময়। হায় হায়! আমরা নেহাৎ সেকেলে।

শ্রীমন্ত। মাপ ক'রবেন, আপনার পরিচয় নেওয়া হয় নি!

কল্যাণ। ইনি হ'চ্ছেন মণিময় রায়। বঙ্গীয় আইন-সভার ইলেক্‌শনে একজন নির্ব্বাচনপ্রার্থী।

শ্রীমন্ত। সে তো ওই লাঙল দেখেই বুঝেছি।

কল্যাণ। আর পরিচয় হ'চ্ছে ইনি—সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী।

শ্রীমন্ত। [লাফাইয়া উঠিয়া] বাই জোভ! সুভদ্রার এখনও বিয়ে হয় নি! থ্যাঙ্ক গড, আই অ্যাম নট্ টু লেট!

মণিময়। ও আবার কি কথা?

শ্রীমন্ত। ও দেশে কত ডিউক, প্রিন্স, বড় বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আজ দেখছি ঠকি 'ন! [কল্যাণের প্রতি] সুভদ্রা কোথায় ?

কল্যাণ। খুড়িমা আর সুভদ্রা—দু জনই ভিতরে আছেন।

শ্রীমন্ত। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আসছি !

দ্রুত প্রস্থান

মণিময়। কল্যাণবাবু, এটা আবার কি রকম হ'ল ?

কল্যাণ। ঠিকই হচ্ছে। সুভদ্রার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছিল।

মণিময়। আমাকে তা বলেন নি কেন ?

কল্যাণ। সে অনেক দিনের কথা,—সর্ব্বানন্দবাবু বেঁচে থাকতে !

মণিময়। তবে আবার আজকে এসে তিনি খামকা গোলমাল ক'রছেন কেন ? চক্রধরবাবু, আপনি যে চুপ ?

চক্রধর। আজ্ঞে, ইউরোপের কথা শুনে আমার আর কথা স'রছে না।

মণিময়। কিন্তু আপনি উকিল ; সর্ব্বানন্দবাবুর উইলের সর্ত্ত ভঙ্গ ক'রে বিয়ে হ'লে আপনি দায়ী হবেন।

চক্রধর। আমি থাকতে ওরকম আপোষের বিয়ে হ'তে পারবে না।

কল্যাণ। সে জানি, উকিল থাকতে আপোষ হবে না।

মণিময়। কল্যাণবাবু, এ যে আর এক বিপদ !

কল্যাণ। বিপদটা কি ?

মণিময়। শ্রীমন্তবাবু যদি গোলমাল শুরু করেন ?

কল্যাণ। আপনি আর একটা বিয়ে ক'রবেন—বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই।

চক্রধর। কি বলেন কল্যাণবাবু ? বাংলা দেশের সব মেয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে—আই. সি. এস. ছাড়া কাউকে বিয়ে ক'রবে না।

কল্যাণ। মণিময়বাবু আই সি. এস-এর চেয়ে কম কি ?

মণিময়। আপনি তো জানেন না কল্যাণবাবু, প্রেম কি বস্তু !

কল্যাণ। একেবারে জানি না, তা নয়। কিছু দিন এক ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারি চাকরি করেছিলাম, সেই সময় একদিন প্রেমের ফর্মুলা পেয়েছিলাম।

মণিময়। ডাক্তারখানায় ?

কল্যাণ। আজ্ঞে হাঁ, এক ডাক্তারের প্রেস্ক্রপশনে।

মণিময়। কি রকম ?

কল্যাণ। শুনুন তবে—

নির্বুদ্ধিতা ½ মাত্রা
কৌতূহল ½ মাত্রা

তার সঙ্গে যোগ—অশ্রুজল যত খুশি ; বোতল ঝাঁকিয়ে দিনে দুইবার সেব্য—সকালে এবং বিকালে।

মণিময়। ওটা বোধ হয় পরিহাস !

কল্যাণ। আপনি কি সত্যি মনে করেছিলেন ?

মণিময়। ঠিক বুঝেছি ; লাঙল ধরেছি ব'লেই যে সেন্স অব হিউমার ছেড়েছি, এমন নয়।

কল্যাণ। সেন্স অব হিউমার আছে তো এমন ক্ষেপে উঠলেন কেন ?

মণিময়। আপনি কি বুঝবেন ? কোন মেয়ের জন্য পাগল হ'লে বুঝতেন কি বিপদ আমার !

কল্যাণ। অন্তত এটুকু বুঝেছি, মেয়ে নিয়ে পাগলামি করা ছাড়াও জীবনে অনেক গুরুতর কাজ আছে।

মণিময়। বলেন কি ?

কল্যাণ। মেয়েমানুষ এমন কিছু নয়, যার একটার বদলে আর একটাকে দিয়ে কাজ চলে না।

চক্রধর। কিন্তু কল্যাণবাবু, মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও যদি শ্রীমন্তর জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তা হ'লে কিন্তু—

মণিময়। কি সর্ব্বনাশ! মাও পাগল, মেয়েও পাগল! আমাকে আর পাগল করবেন না আপনারা।

চক্রধর। কল্যাণবাবু, আমি আমার কর্ত্তব্য ক'রে যাব।

মণিময়। এখন আপনার কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগের উপরেই আমার একমাত্র ভরসা।

কল্যাণ। শ্রীমন্তও কেন ইলেক্‌শনে দাঁড়াক না? এখনও তো সময় আছে।

মণিময়। অসম্ভব!

এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে কথা বলিতে বলিতে শ্রীমন্ত ও জগদম্বার প্রবেশ

চক্রধরবাবু, আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবেন না।

জগদম্বা। আমার কি বাবা অসাধ? কর্ত্তারও সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তুমি চ'লে গেলে বিলেতে, কর্ত্তার কি বুদ্ধি হ'ল, শেষ বয়সে তিনি এক অদ্ভুত উইল ক'রে গেলেন! মেয়েমানুষ আমি, কি করব বল?

শ্রীমন্ত। আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমি ক'রব।

মণিময়। চক্রধরবাবু, মনে থাকে যেন আপনার কর্ত্তব্য!

শ্রীমন্ত। ঠিক কথা চক্রধরবাবু, আপনার কর্ত্তব্য যেন মনে থাকে।

চক্রধর। তা হ'লে যে আপনাকে ইলেক্‌শনে দাঁড়াতে হবে।

শ্রীমন্ত। আমি ইলেক্‌শনেই দাঁড়াব।

মণিময়। অসম্ভব!

কল্যাণ। অসম্ভবটা কি ?

মণিময়। সে কি ওঁর সাধ্য ?

শ্রীমন্ত। আমি ইলেক্‌শনে নাম্‌ব।

মণিময়। কোন্ কেন্দ্র থেকে ?

কল্যাণ। ওহে, তা হ'লে একটা সহজ জায়গা বেছে নাও, যেখানে প্রতিযোগিতা কম।

শ্রীমন্ত। তাতে মণিময়বাবুর উপরে অন্যায় সুযোগ নেওয়া হবে। উনি যে কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছেন সেই কেন্দ্র থেকেই দাঁড়াব।

মণিময়। অসম্ভব! আমার লাঙল দেখছেন তো! যে রকম ফসল বুনেছি, তাতে—

শ্রীমন্ত। আপনি ফসল বুনেছেন, আমি ফসল কেটে ঘরে তুলব।

মণিময়। যাক, নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমার কেন্দ্র থেকে আপনার কোন আশা নেই।

জগদম্বা। তোমরা ব'স বাবা, দেখি চায়ের জোগাড় হ'ল কি না!

প্রস্থান

কল্যাণ। ওহে শ্রীমন্ত, এত বড় দুঃসাহসের কাজ করতে যাচ্ছ কোন্ ভরসায় ?

শ্রীমন্ত। লীগ অব নেশন্‌স-এর ভরসায়, সেখানে আমার শিক্ষানবিশী কি না!

মণিময়। আপনার প্রোগ্রাম কি ?

শ্রীমন্ত। ভেবে চিন্তে একটা স্থির করা যাবে।

মণিময়। হাঃ হাঃ হাঃ! আবার ভাববেন কবে ? ভাবতে ভাবতে যে ইলেক্‌শন এসে পড়বে ?

শ্রীমন্ত। তা পড়ুক! ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। আসুন, আপনাদের চা হয়েছে।

মণিময়। সুভদ্রা দেবী, শুনেছেন বোধ হয় যে শ্রীমন্তবাবু ইলেক্‌শনে দাঁড়াচ্ছেন।

সুভদ্রা। তা হবে।

মণিময়। অবশ্য উনি রিটার্নড্‌ হবেন না, কারণ ওঁর কোন প্রোগ্রাম নেই। শুনুন সুভদ্রা দেবী, আমি কাউন্সিলে গেলে নর-নারীর সমান রাজনৈতিক অধিকারের জন্য চেষ্টা করব। নারী জাতির সত্য যুগের সূচনা ক'রে দেব। আপনাদের জাতের প্রতি এই উপকারের জন্য অন্তত কৃতজ্ঞতার বশেও আমাকে মনে রাখবেন।

সুভদ্রা। [শ্রীমন্তের প্রতি] আর আপনি কি করবেন ?

শ্রীমন্ত। তা হ'লে আবার বত্রিশ সিংহাসনে দাঁড়াতে হ'ল দেখছি! [কেরাসিন কাঠের বাক্সের উপরে উঠিয়া] সুভদ্রা দেবী, আমি কাউন্সিলে গিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করব—যাতে নারীরা রাজনৈতিক অধিকার না পায়।

সুভদ্রা। বলেন কি ? কিন্তু কেন ? নারীদের প্রতি এ অবজ্ঞা কেন ?

শ্রীমন্ত। অবজ্ঞা নয় !—কৃপা, দয়া, সহানুভূতিও বলতে পারেন।

সুভদ্রা। কি রকম ?

শ্রীমন্ত। ওদেশে গিয়ে নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের অর্থ কি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আজ দু হাজার বছর ধ'রে পুরুষেরা রাষ্ট্র-নীতির কর্ণধারত্ব ক'রে রাষ্ট্রকে, সমাজকে এমন দুর্বিপাকের মধ্যে এনে ফেলেছে, যেখানে তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তিতে আর কুলোচ্ছে না। এখন তারা ভণ্ড উদারতার ধ্বনিতে মেয়েদের ডেকে ব'লছে —এস, তোমরা আমাদের সমকক্ষ, তোমাদের সমানাধিকার। যে

নৌকাখানাকে আমরা প্রায় বাণচাল ক'রে দিয়েছি, এস তোমরা তাকে রক্ষা কর। পুরুষ ধূর্ত্ত--মেয়েরা নির্ব্বোধ। আমি যদি মেয়ে হতাম, উত্তর দিতাম—বাণচাল নৌকাতে উঠে সমান অধিকার নিতে আমি রাজি নই। আগে নৌকাখানাকে ভিড়িয়ে ঘাটে নিয়ে এস, তারপরে না হয় আমাদের উপরে ভার ছেড়ে দিও। আগামী দু হাজার বছরের জন্য আমরা রাষ্ট্রের ভার নিতে রাজি আছি। কিন্তু তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা ক'রতে যাব কোন্ দুঃখে!

মণিময়। আপনি মোটেই প্রগতিবাদী নন।

শ্রীমন্ত। প্রগতি মানেই পশ্চাদ্‌গতি! প্রগতিবাদীরা যতই এগোচ্ছে ততই পিছোচ্ছে, কারণ তাদের মুখ লক্ষ্যের বিপরীত দিকে।

মণিময়। কি সর্ব্বনেশে মতামত! পথে যে আপনার অ্যাক্সিডেণ্ট হয় নি—আমার কাছে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে!

সুভদ্রা দেবী, আমি কাউন্সিলে গেলে যাতে দেশের আপামরসাধারণ সকলে ভোটের অধিকার পায় চেষ্টা ক'রব। দেশের কথা মনে ক'রে আমাকে স্মরণ রাখবেন।

শ্রীমন্ত। [কেরাসিন কাঠের বাক্সের উপর হইতে] আর আমি কাউন্সিলে গেলে দেশের আপামরসাধারণ সকলে যাতে ভোটের অধিকার না পায় তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব।

মণিময়। বিশ্বাসঘাতক!

শ্রীমন্ত। বিশ্বাসঘাতক আপনারা। দরিদ্র অশিক্ষিতকে ভোটের অধিকার দেবার সময়ে আপনারা এই হিসাব ক'রে থাকেন যে, নামমাত্র মূল্যে ওদের ভোট আপনারা কিনতে পারবেন। আমার ভোট কিনতে যদি আপনাকে একশো টাকা খরচ ক'রতে হয়, ওদের

ভোট কিনতে আপনার খরচ হবে পাঁচ সিকে! আপনাদের দেশ-হিতৈষিতা মানে—নিজেদের তহবিলের ব্যয় সংক্ষেপ।

মণিময়। আমরা যে গণতন্ত্রী! আমি চাই গণতন্ত্র।

শ্রীমন্ত। আর আমি চাই ডিক্টেটার, আমি চাই ডিক্টেটারী শাসন।

মণিময়। তার মানে আপনি চান—বাহুবল।

শ্রীমন্ত। বাহু দেখিয়ে ভোট দেওয়াটাও বাহুবলেরই নিরীহ সংস্করণ। আমি চাই ডিক্টেটার, যে বাঙালীকে কখনও হাতে ধ'রে কখনও কানে ধ'রে চলতে শেখাবে, বলতে শেখাবে, বাঁচতে শেখাবে, দরকার হ'লে মরতে শেখাবে। শেখাবে সে বাঙালীকে—রাত্রে রেডিও বাজিয়ে প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করবার অধিকার তোমার নেই; শেখাবে সে বাড়ির আবর্জ্জনা পথে ফেলবার অধিকার তোমার নেই; শেখাবে সে নিজের বাড়ির ধোঁয়া দিয়ে পাশের বাড়ির নিশ্বাস রোধ করবার অধিকার তোমার নেই।

মণিময়। এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার! আমরা চাচ্ছি জাতির জাগরণ; আর আপনি বলছেন ধোঁয়া, আবর্জ্জনা আর রেডিও!

সুভদ্রা। কিন্তু জাতির জাগরণের সঙ্গে চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ওটা সেরে আসলে হ'ত না?

শ্রীমন্ত। [নামিয়া] চল কল্যাণ।

কল্যাণ। চলুন চক্রধরবাবু, মণিময়বাবু!

সকলের পাশের দ্বার দিয়া প্রস্থান

একটু পরে পিছনের দ্বার দিয়া শ্রীমন্ত ও সুভদ্রার প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কি? আবার ডেকে আনলে কেন?

সুভদ্রা। একটা কথা আছে। তুমি ইলেক্‌শনে দাঁড়িও না।

শ্রীমন্ত। কেন ?—ওঃ, বুঝেছি তুমি মণিময়বাবুকে বিয়ে করতে চাও !

সুভদ্রা। নিশ্চয়ই নয়।

শ্রীমন্ত। তবে কেন ?

সুভদ্রা। তুমি হয়তো রিটার্নড হ'তে পারবে না।

শ্রীমন্ত। তবে তোমাকে পাব কি ক'রে ?

সুভদ্রা। বাবার সম্পত্তি না হয় নাই-ই পেলাম !

শ্রীমন্ত। পাগল ! প্রেমের ভিত্তি হচ্ছে ঐশ্বর্য্য। অর্থ ছাড়া প্রেম নিতান্তই নিরর্থক ! কিন্তু তুমি ভেব না, আমি রিটানড হবই।

সুভদ্রা। কিন্তু ইলেক্‌শনে তোমার সিম্বল হবে কি ? মণিময়বাবুর তো লাঙল—ওটাকে উনি বেশ চালিয়াছেন।

শ্রীমন্ত। কারো কারো টানে লাঙল চলে ভালো।

সুভদ্রা। তোমার সিম্বল কি স্থির কর—আমি রেশমী সুতা দিয়ে তোমার জামাতে এঁকে দেব ! ছিপ, বঁড়শি, লাটাই ; নৌকা, ঘুঘু, বাদুড় ; শিয়াল, ঝাঁটা, তাঁত ; ঢেঁকি, কুলো, ধামা—সব কিন্তু নিঃশেষ ! ভাল সিম্বলও তো আর দেখি না !

শ্রীমন্ত। আমার সিম্বল হচ্ছে—ফুটবল।

সুভদ্রা। ফুটবল ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ,—একেবারে পাঁচ নম্বর ম্যাক্‌গ্রেগার ফুটবল।

সুভদ্রা। কিন্তু—

শ্রীমন্ত। কিন্তু কি ? মণিময়বাবু ?

সুভদ্রা। না, তুমি।

শ্রীমন্ত। আমি কি ?

সুভদ্রা। [অতি দ্রুত] তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

শ্রীমন্ত। সত্যি ! সত্যি আর একবার বল সুভদ্রা !

এমন সময়ে ঘরের রেডিও-সেটে গান বাজিয়া উঠিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে! কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে
গরব সব হায় কখন টুটে যায় সলিল বহে যায় নয়নে।"

হঠাৎ গান শুনিয়া দুই জনে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল—অন্য লোক আসিয়াছে নাকি!
শেষে রেডিওর কণ্ঠ বুঝিয়া দুই জনেই হাসিল

দেখলে তো কেমন দৈববাণী!

জগদম্বা। [নেপথ্য হইতে] সুভো, কোথায় গেলি আবার?

সুভদ্রা। মা ডাকছেন, তুমি এগোও, আমি আসছি।

শ্রীমন্ত। তুমি দেরি ক'র না কিন্তু—

সুভদ্রা। [পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া] কিন্তু মণিময়বাবু—

শ্রীমন্তর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

জগদম্বা। [নেপথ্য হইতে] সুভো, সবাই ব'সে আছে।

সুভদ্রা। আসি মা। রেডিওটা বিগড়ে গেছে। [অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে] যা তা বলতে আরম্ভ ক'রেছে।

প্রস্থান

রেডিওর কণ্ঠে সঙ্গীত

"এ সুখ ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি, কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশী, গরব যায় ভাসি, পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে।"

দ্বিতীয় অঙ্ক

খ-দৃশ্য

গৌড়নগর; পরলোকগত শ্রেষ্ঠী চন্দ্রসেনের প্রাসাদ; এখন তাহার একমাত্র মালিক ভদ্রা। বাড়ির দোতলার প্রশস্ত বলভিতে শ্বেতপাথরে বাঁধান বসিবার স্থান; মেঝে শ্বেতপাথরের; বলভি বা দোতলার ছাদের দুই ধারে দুই সারি স্তম্ভ; স্তম্ভের উপরে ছাদ; ডান ও বাম দুই দিক দিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু প্রবেশদ্বার দৃষ্টির অন্তরালে; রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে দুইটি দ্বার; প্রত্যেক দ্বার দিয়া স্বতন্ত্র একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায়; দ্বার দুইটি বন্ধ, কেবল লোক প্রবেশ করিবার সময় খুলিবে; পিছনের একটি দ্বার দিয়া ভদ্রা ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া একটি স্তম্ভের পাশে লুকাইল; একটু পরেই বল্লভা একখানা গায়ের চাদর হাতে করিয়া প্রবেশ করিয়া ভদ্রাকে না দেখিয়া বলিতে লাগিল।

সময় অপরাহ্ণ

বল্লভা। মেয়েটা ঠাণ্ডা লেগেই মরবে; এই চৈত্র মাসের বিকেলে কি ঠাণ্ডাই না পড়েছে, আমার বুড়ো হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে!

অগ্রসর হইল; ভদ্রা আর একটি স্তম্ভের পাশে লুকাইল

না বাপু, আর পারি না, এমন মেয়ে সাত জন্মে দেখি নি, ঠাণ্ডা লেগেই মরবে, তার আগে আমি মরলে বাঁচি।

সে খানিকটা অগ্রসর হইল, ভদ্রা আর এক স্তম্ভের পাশে লুকাইল

গেল কোথায়? এই আছে, এই নেই, হেঁটে চলে, না উড়ে চলে— বুঝতে পারি না।

ভদ্রা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেই বল্লভা তাহাকে দেখিতে পাইল

আবার লুকোনো হচ্ছে, বুড়ো মেয়ের লুকোচুরি খেলা দেখ!

ভদ্রা। [দূরে দাঁড়াইয়া] বল্লভা, আমাকে যে বড় বুড়ো বললে?

বল্লভা। বুড়ো নও তো কি ?

ভদ্রা। তা হ'লে আবার ছোট মেয়ের মত শাসন কর কেন ?

বল্লভা। করব না ? একশো বার করব।

ভদ্রা। তা কর, কিন্তু আমি বুড়ো না খুকী—সেটা ঠিক ক'রে বল।

বল্লভা। লোকের কাছে তুমি বুড়ো, আমার কাছে খুকী।

ভদ্রা। ই-স !

বল্লভা। নাও, চাদর গায়ে দাও। চৈত্র মাসের ঠাণ্ডায় অসুখ যদি না হয় তো কি বলেছি।

ভদ্রা। আমাকে ধরতে পারলে চাদর গায়ে দেব।

বল্লভা। শোন, কথা শোন ! আমি নাকি তোমাকে ধরতে পারি !

ভদ্রা। তা হ'লে চাদর পরব না।

বল্লভা। বটে !

ভদ্রা। বটে বটে বটে—যা ঘটে তা ঘটে।

বল্লভা। নাও, চাদর নাও।

ভদ্রা। আগে ধর।

বল্লভা। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।

বল্লভা তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ভদ্রা কখনও স্তম্ভের আড়ালে, কখনও বসিবার বেদীর আড়ালে লুকাইতে লাগিল ; বহুক্ষণ ছুটিবার পরে একবার বল্লভা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দৌড়াইবার সময়ে ভদ্রা হাসিতে লাগিল, বল্লভা হাসিতে ও হাঁপাইতে ছিল

এইবার !

ভদ্রা। লক্ষ্মী বল্লভা, মের না।

বল্লভা। মারব না ? একশো বার মারব।

ভদ্রা। একশো পূর্ণ হবার অনেক আগেই ম'রে যাব।

বল্লভা। ষাট, কি যে অলক্ষুণে কথা! হ্যাঁ ভদ্রা, বিয়ে করবি না?

ভদ্রা। করব।

বল্লভা। কাকে?

ভদ্রা। তোমার বরকে।

বল্লভা। এত বড় কথা! যাকে একেবারে দেখতে পার না, তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

ভদ্রা। কে সে?

বল্লভা। গোপালদেব।

ভদ্রা। [গম্ভীরভাবে] বল্লভা, ও নাম আমার সম্মুখে ক'র না।

বল্লভা। একশো বার করব।

ভদ্রা। লক্ষ্মী বল্লভা, ক'র না।

বল্লভা। তবে চাদর গায়ে দাও।

ভদ্রা চাদর গায়ে দিল

ভদ্রা বল্লভা, এবার যাও, লোক আসবার কথা আছে।

বল্লভা। তা যাচ্ছি, কিন্তু আমি দরজা দিয়ে দেখব, চাদর ফেলেছ কি ছুটে চ'লে আসব

ভদ্রা। না, ফেলব না, তুমি এবার যাও।

বল্লভার প্রস্থান

বাম পার্শ্ব দিয়া নাগভট্ট, ইন্দ্রদত্ত ও ঈশ্বরঘোষের প্রবেশ

আসুন আপনারা, উপবেশন করুন।

নাগভট্ট। মা, তোমার কল্যাণ হোক।

ভদ্রা। চন্দ্রসেনের ধনাগারে যত অর্থ আছে আমি আপনাদের হাতে দিচ্ছি, গৌড়কে আপনারা নিঃশত্রু করুন।

নাগভট্ট। গৌড় তো নিরাপদ হয়েছে মা।

ঈশ্বরঘোষ। বৎস-রাজ পরাজিত; রাষ্ট্রকুট-রাজ সন্ধির জন্য প্রার্থনা করেছে, গত দশ বছরের মধ্যে এমন শান্তি কখনও হয় নি!

ভদ্রা। আপনারা ভ্রান্ত এমন কথা বলতে সাহস করি না, কিন্তু গৌড় এতদিনে যথার্থ পরাধীন হ'ল।

ইন্দ্রদত্ত। কার কথা তুমি বলছ?

ভদ্রা। সে আপনারা না জানেন তা নয়। কার আদেশে গৌড়ের নাগরিকদের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে? গৌড়কে নাগপাশে জড়াচ্ছে কে?

নাগভট্ট। তুমি কি গোপালদেবের কথা বলছ?

ভদ্রা। আপনারা কি জানেন না?

নাগভট্ট। সবই জানি মা, তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তুমি চন্দ্রসেনের কন্যার উপযুক্ত কথাই বলেছ, শ্রেষ্ঠী আজ বেঁচে থাকলে ঠিক এই কথাই বলতেন।

ভদ্রা। আপনারা গৌড়ের স্বাধীনতার জন্য কি ক'রছেন?

ঈশ্বরঘোষ। আমরা একেবার নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই, আজ তোমার উৎসাহ আমাদের প্রাণে নূতন বল বঞ্চার করেছে।

এমন সময়ে পিছনের একটি দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া বল্লভা ডাকিল

বল্লভা। ভদ্রা, তোমার দুধ খাবার সময় হয়েছে, শিগগির এস।

ভদ্রা। আপনারা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন; বল্লভা বড় সোজা লোক নয়, আমি না গেলে হয়তো এক বাটি দুধ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। আপনাদের বসিয়ে রাখবার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

নাগভট্ট। আমরা বসছি, তুমি যাও মা।

তাহাদের উপবেশন ও ভদ্রার পিছনের দ্বার দিয়া প্রস্থান

ঈশ্বরঘোষ। ভদ্রা খুব বুদ্ধিমতী।

ইন্দ্রদত্ত। হবে না, মেয়ে কার?

নাগভট্ট। ঈশ্বরঘোষ, ভদ্রার রাগের কারণ কি জানি না, কিন্তু আজ সকালে গোপালদেব যে আদেশ প্রচার ক'রেছে, তাতে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

ইন্দ্রদত্ত। আবার কি নূতন আদেশ হ'ল?

নাগভট্ট। রাজকোষে আমি যে ঋণ দিয়েছিলাম, সে অর্থ আর ফিরে পাব না।

উভয়ে। কি সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্রদত্ত। তোমার অপরাধ কি?

নাগভট্ট। আমি দুর্ব্বল।

উভয়ে। কি সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্রদত্ত। এ যে জয়বৰ্দ্ধনের আদেশকেও ছাড়িয়ে গেল!

নাগভট্ট। জয়বর্দ্ধনের দোষ ছিল। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানি, সে গৌড়ের অশ্ববাহিনীর জন্য যে ঘাস জোগাত, বৎস-রাজের কাছে ঘুষ খেয়ে তাতে বিষাক্ত ঘাস দিত।

ইন্দ্রদত্ত। দিত—দিত, তা ব'লে জয়বৰ্দ্ধনকে নির্ব্বাসনের আদেশ!

ঈশ্বরঘোষ। নাঃ, গৌড়ে ধন প্রাণ নিয়ে বাস করা দায় হয়ে উঠল।

নাগভট্ট। এর চেয়ে বৎস-রাজের আক্রমণ ভাল ছিল।

ঈশ্বরঘোষ। হ্যাঁ, কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হ'ত।

ইন্দ্রদত্ত। যুদ্ধ দেখে সোনার দর চড়িয়ে দিয়ে কিছু পেতাম।

নাগভট্ট। চড়া স্থদে অর্থ ধার দিতাম, সে ছিল বেশ।

হর্ষগুপ্ত নামধেয় এক নাগরিক একজন রাজভৃত্যকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রবেশ করিল। রাজভৃত্যের বুকে এক নাক'ড়া বাঁধা; সে বেচারা নাক'ড়ার ধ্বনিতে চতুষ্পথে রাজ-আদেশ ঘোষণা করিয়া থাকে। সকলে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া একযোগে প্রশ্ন করিল

নাগভট্ট। কি ব্যাপার হর্ষগুপ্ত ?

ইন্দ্রদত্ত। এ আবার কে ?

ঈশ্বরঘোষ। আবার কি হ'ল ?

হর্ষগুপ্ত। এর কাছে শোন। বল বেটা, কি হয়েছে !

পৃষ্ঠে গুঁতা

রাজভৃত্য। কর্তা, আমার কি দোষ ?

হর্ষগুপ্ত। দোষ আমাদের ! তুই বেটা সাধু।

রাজভৃত্য। আজ্ঞে না, আমার ভাইয়ের নাম সাধু।

হর্ষগুপ্ত। বল, কি হয়েছে !

দুই গুঁতা

রাজভৃত্য। আজ্ঞে, আমার কি দোষ ?—রাজার অদেশ।

হর্ষগুপ্ত। বেটা, টাকা খেয়ে—

রাজভৃত্য। আজ্ঞে, তাই বা পেলাম কোথায় ? এক মাসের বেতন বাকি—

নাগভট্ট। কিন্তু কি আদেশ ও ঘোষণা করছিল ?

হর্ষগুপ্ত। বল বেটা।

রাজভৃত্য। আজ্ঞে, আপনারা যেমন রাগ করেছেন, সে আদেশ শোনালে—

হর্ষগুপ্ত। না শোনালেও কম রাগ করব না।

কয়েক ঘা দিল

[রাজভৃত্য। আজ্ঞে, আর দরকার নেই, বুঝেছি।

হর্ষগুপ্ত। চতুষ্পথে যেমন ক'রে নাকাড়া পিটে ঘোষণা করছিলে, তেমনই ক'রে শোনাও।

রাজভৃত্য। আজ্ঞে, আচ্ছা।

সে যথারীতি নাকাড়া পিটিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল

পরমভট্টারক পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজ গোপালদেবের আদেশ অবধান কর—যদি কোন গৌড়ের ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া বিক্রয় করে, ধরা পড়িলে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে।

নাগভট্ট। কি সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্রদত্ত। এ যে গৌড়ের সনাতন অধিকার! সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ!

হর্ষগুপ্ত। আরও আছে—বল।

রাজভৃত্য। [নাকাড়া পিটিয়া] গৌড়ের অধিবাসীদের কেহ রাজপথে আবর্জ্জনা ফেলিলে তাহার শত দ্রম্ম জরিমানা হইবে।

ঈশ্বরঘোষ। নাঃ, দেশে আর থাকা চলল না। আমরা আবহমান কাল থেকে বাড়ির আবর্জ্জনা রাজপথে ফেলে আসছি। অসম্ভব, এ আদেশ কে মানবে?

নাগভট্ট। জীবনের সব সুখই তো গিয়েছে, পথে আবর্জ্জনা ফেলতে না পারলে বেঁচে কি সুখ!

রাজভৃত্য। [নাকাড়া পিটিয়া] রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হইলে বাড়িতে কেহ সঙ্গীত বা কোলাহল করিয়া প্রতিবেশীর শান্তি ভঙ্গ করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

ঈশ্বরঘোষ। অসম্ভব, আমার বাড়িতে আমি যা খুশি করব।

নাগভট। প্রতিবেশীর শান্তি ভঙ্গ না করতে পারলে কোন্ সুখে বাঁচা!

ইন্দ্রদত্ত। আর কিছু আছে?

রাজভৃত্য। আজ্ঞে না।

হর্ষগুপ্ত। নে, নাকাড়ায় ঘা দে; আর একটা আদেশ আছে।

রাজভৃত্য ভয় পাইয়া ঘা দিল

বল, গৌড়ের ত্রিপিটকের আদেশে অত্যাচারী গোপালদেব সিংহাসনচ্যুত হইল।

রাজভৃত্য। আজ্ঞে—

হর্ষগুপ্ত। আজ্ঞে কি রে? বল তো, রাজা কে?

রাজভৃত্য। আজ্ঞে, যার হাতে লাঠি।

হর্ষগুপ্ত। [হাতের যষ্টি দেখাইয়া] তবে বল।

রাজভৃত্য নাকাড়া ফেলিয়া সবেগে প্রস্থান করিল

নাগভট্ট। হর্ষগুপ্ত, ব্যাপার তো দেখছ। শীঘ্র এর ব্যবস্থা না করলে গৌড়ে ধন প্রাণ নিয়ে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

হর্ষগুপ্ত। তোমরা কর, আমি চললাম।

নাগভট্ট। চললে কোথায়?

ইন্দ্রদত্ত। এ দিকে গৌড়ের সর্ব্বনাশ হয়, আর তুমি চললে!

হর্ষগুপ্ত। দেশের জন্য সব ত্যাগ করা যায়, কেবল একটি জিনিস ত্যাগ করা চলে না।

তিন জনে। [সমস্বরে] আত্মসম্মান?

হর্ষগুপ্ত। না, খেলা দেখবার সুযোগ।

নাগভট্ট। খেলা? কি খেলা?

হর্ষগুপ্ত। তোমরা আছ কোথায়? নেহাৎ সেকেলে লোক দেখছি। জান না কি যে আজ বাসুদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে নিখিল-ভারতীয় হাড়ুডুডু প্রতিযোগিতা আছে?

নাগভট্ট। তাতে কি হয়েছে?

হর্ষগুপ্ত! কি হয়েছে? গান্ধার থেকে বিখ্যাত খেলোয়াড় রূপচাঁদ এসেছে। সতেরো হাজার লোক খেলা দেখতে সমবেত হয়েছে।

নাগভট্ট। রূপচাঁদটা কে?

হর্ষগুপ্ত। [অত্যন্ত বিস্ময়ে] রূপচাঁদটা কে? এর পরে বলবে— চন্দ্রগুপ্ত কে? বিক্রমাদিত্য কে? যুধিষ্ঠির কে? রূপচাঁদকে জান না? রূপচাঁদ ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

নাগভট্ট। হর্ষগুপ্ত, অবাক করলে! এদিকে গৌড়ের স্বাধীনতা লুপ্ত-প্রায়, আর তুমি যাচ্ছ কোন্ রূপচাঁদের খেলা দেখতে!

হর্ষগুপ্ত। স্বাধীনতা অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে, কিন্তু রূপচাঁদ অপেক্ষা করবে না! আচ্ছা, তোমরা সত্যি রূপচাঁদের হাড়ুডুডু খেলা দেখ নি? সে যে একটা নতুন প্যাঁচ আবিষ্কার করেছে, তা দেখ নি?

নাগভট্ট। আমরা গোপালদেবের প্যাঁচে কাতর, আর—

হর্ষগুপ্ত। রেখে দাও তোমার গোপালদেব; রূপচাঁদের হাতে পড়লে তার প্রাণ যাবে। আচ্ছা, আমি তোমাদের রূপচাঁদের খেলার ধরণটা দেখাচ্ছি।

হর্ষগুপ্ত মালকোঁচা মারিয়া হাড়ুডুডু খেলার ধরণে নাগভট্টের দিকে ছুটিয়া গেল

ডিগ-ডিগ-ডিগ-ডিগ—

নাগভট্ট। [ছুটিতে ছুটিতে] আঃ, আঃ, ও আবার কি?

হর্ষগুপ্ত। ডিগ-ডিগ-ডিগ-ডিগ—[ইন্দ্রদত্তের দিকে ছুটিল]

ইন্দ্রদত্ত। [পলায়ন করিতে করিতে] তামাসা রাখ হর্ষগুপ্ত।

তখন হর্ষগুপ্ত একবার ঈশ্বরঘোষের দিকে, একবার নাগভট্টের দিকে, একবার ইন্দ্রদত্তের দিকে ছুটিতেই লাগিল; তাহারা পলায়ন করিয়া বাঁচিতে লাগিল; হঠাৎ সে স্থূলকায় ইন্দ্রদত্তকে ল্যাং মারিয়া ফেলিয়া দিল, অধঃপতিত ইন্দ্রদত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল।

হর্ষগুপ্ত। [আনন্দে] এবার তো দেখলে, রূপচাঁদ কে! এই হচ্ছে তার নতুন প্যাঁচ।

ইন্দ্রদত্ত। [উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে] এদিকে দেশ যায়, আর তোমার তামাসা! চ'ললে খেলা দেখতে!

হর্ষগুপ্ত। [বক্তৃতার সুরে] দেশের জন্য সব ত্যাগ করতে পারি। আমি কি গৌড়ের স্বাধীনতার জন্য গুর্জ্জরের সঙ্গে যুদ্ধে নিজের প্রাণ বিপন্ন করি নি? আমি কি রাজকোষে অর্থাভাব হ'লে নিজের অর্থ দান করি নি? আমি কি গৌড়ে শান্তি স্থাপনের জন্য বারংবার অস্ত্রধারণ করি নি? কিন্তু না, খেলা দেখবার সুযোগ ত্যাগ করতে পারব না। গুর্জ্জরের কাছে আমরা পরাজিত হয়েছি, রাষ্ট্রকুটের কাছে পরাজিত হয়েছি; কিন্তু তাতে তত লজ্জা নেই, কারণ গৌড়ের ইতিহাস—পরাজয়ের ইতিহাস। কিন্তু গান্ধারের খেলোয়াড় রূপচাঁদ এসে যদি হারিয়ে যায়, তবে সে লজ্জা রাখব কোথায়? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। মাপ কর, এতক্ষণে বোধ হয় খেলা আরম্ভ হ'ল।

হর্ষগুপ্তের প্রস্থান

নাগভট্ট। ইন্দ্রদত্ত, সত্যি, খেলাধূলা না দেখলে লোকে আমাদের সেকেলে বলবে।

ইন্দ্রদত্ত। যতদিন অর্থ আছে, কেউ কিছু বলবে না।

ঈশ্বরঘোষ। দেখ, গোপালদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হ'লে যুদ্ধ জানা চাই, আমাদের দিয়ে তো হবে না।

নাগভট্ট। মণিভদ্রকে দলে নিতে হবে, গোপালদেবের পরেই তার যুদ্ধবিদ্যায় খ্যাতি।

ইন্দ্রদত্ত। মণিভদ্রকে সহজেই দলে পাওয়া যাবে।

ঈশ্বরঘোষ। তবে তাকে একবার সংবাদ পাঠাও।

নাগভট্ট। সংবাদ পাঠাতে হবে না, এল বলে; এ বাড়ি তো তার অপরিচিত নয়।

মণিভদ্রের প্রবেশ

এস এস, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

মণিভদ্র। যার অপেক্ষা করবার কথা, তার দেখা নেই! তোমরা হঠাৎ?

নাগভট্ট। মণিভদ্র, সময় অল্প; তুমি তো সবই জান; গোপালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে, নইলে গৌড়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হ'ল ব'লে।

মণিভদ্র। যখন তোমরা বলছ বিশ্বাস করছি, কিন্তু গৌড় যে কাকে স্বাধীনতা বলে, তা আজও বুঝতে পারলাম না। আমাকে কি করতে হবে?

নাগভট্ট। তুমি হবে আমাদের সেনাপতি।

মণিভদ্র। আমি সম্মত আছি, কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে কিছু দিতে হবে।

নাগভট্ট। সে জানি, রাজনীতি মানেই আদান-প্রদান; কি চাও? অর্থ?

মণিভদ্র। না।

ঈশ্বরঘোষ। গৌড়ের সিংহাসন?

মণিভদ্র। তাতে আবার কষ্ট ক'রে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে, অতএব তাও চাই না।

নাগভট্ট। বল, কি চাও?

মণিভদ্র। তোমাদের অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা। তোমরা ইচ্ছা করলে সবই পার।

একটু নরম সুরে

জানই তো ভাই, ভদ্রার কাছে বাঁধা পড়েছি। তোমাদের কাজ উদ্ধার ক'রে দিলে তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

নাগভট্ট। নিশ্চয় দিতে হবে।

ইন্দ্রদত্ত। আমরা বিশেষ চেষ্টা করব, কি বল ঈশ্বরঘোষ?

ঈশ্বরঘোষ। নিশ্চয়।

মণিভদ্র। অনেকদিন তোমাদের সাহচর্য্য করছি, কাজেই কথার ওপরে বিশ্বাস আর নেই, একটু লিখে দিতে হবে।

নাগভট্ট। বেশ। এই, কে আছ এখানে?

একজন পরিচারকের প্রবেশ

শীঘ্র লেখনী আর ভূর্জ্জপত্র নিয়ে এস।

পরিচারকের প্রস্থান

মণিভদ্র। দেওয়া নেওয়া, বুঝলে কিনা? আগে তোমাদের কাজ উদ্ধার ক'রে দেব, তারপরে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে।

পরিচারকের লেখনী, মস্যাধার ও ভূর্জ্জপত্র লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান

নাগভট্ট। ইন্দ্রদত্ত, তোমার হস্তাক্ষর ভাল, লেখ। মণিভদ্র, বল, কি লিখতে হবে ?

ইন্দ্রদত্ত লেখার উপকরণ গ্রহণ করিল, মণিভদ্র বলিতে লাগিল

মণিভদ্র। মণিভদ্র, আমরা তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, তুমি আমাদের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া গোপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিলে, আমরা যে রকমে পারি চন্দ্রসেন-কন্যা ভদ্রার সঙ্গে তোমার বিবাহ ঘটাইয়া দিব।

ঈশ্বরঘোষ। অঙ্গীকারটা ভগবানের নামে হ'লে ভাল হ'ত না ?

মণিভদ্র। ভূর্জ্জপত্র ছোট, ওর মধ্যে ভগবানকে ধরবে না, ওটা থাক। নাও, স্বাক্ষর কর।

তিন জনে পত্রে স্বাক্ষর করিলে মণিভদ্র তাহা লইয়া বস্ত্রমধ্যে রক্ষা করিল

নাগভট্ট। এইবার—

মণিভদ্র। শোন এবার, আমি কি ভাবে কাজ করতে চাই। গোপালদেবের প্রাসাদে গিয়ে হঠাৎ তাকে বন্দী করতে হবে ; তারপরে কল্যাণবর্ম্মা, চক্রপাণি, আর জয়াপীড়কে তাদের বাড়ীতে বন্দী করতে হবে। বাস্, বাকী রইল তাদের নীল পদাতিক বাহিনী, তাদের দল ভেঙে বিদায় ক'রে দিলেই হ'ল। তখন তোমরা তোমাদের পোষমানা একটা রাজা নির্ব্বাচন ক'রে নিও, কিংবা চাও তো, নিজেরাই রাজা হয়ো।

নাগভট্ট। না হে, আজকাল রাজাগিরি-চাকরি আর তেমন লাভজনক নয়।

মণিভদ্র। যা বললাম, এই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায় ; এমন ক'রে কাজ করতে হবে যাতে গোপালদেব যুদ্ধ করবার সুযোগ না পায়।

নাগভট্ট। কি বল তোমরা ?

ইন্দ্রদত্ত ও ঈশ্বরঘোষ। এ উত্তম পরামর্শ।

নাগভট্ট। এস এবার বাসুদেবের নামে শপথ করা যাক।

সকলে হাত তুলিয়া ; মণিভদ্রের হাতে তলোয়ার ; সে তাহা তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল

বল সকলে—গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা গোপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া—

কথা শেষ হইতে পারিল না, হঠাৎ নিরস্ত্র গোপালদেব প্রবেশ করিল, চার জনের হাত উত্থিত হইয়া রহিল, তাহারা নামাইতে ভুলিয়া গেল

গোপালদেব। [ব্যঙ্গস্বরে] কি, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাত নামাতেই ভুলে গেলে ? অনেকক্ষণ কষ্ট করেছ, এবার হাত নামাও।

তাহারা হাত নামাইল

[ব্যঙ্গের স্বরে] স্বাধীনতা রক্ষা করতে হ'লে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে ? ব'স।

সকলে বসিল

ইন্দ্রদত্ত। মহারাজের উপবেশন—

গোপালদেব। আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি বসছি।

এই বলিয়া সে রাজভৃত্য কর্তৃক পরিত্যক্ত নাকাড়াটা টানিয়া লইয়া তাহার উপর ব'সল

ঈশ্বরঘোষ, গুর্জ্জর সৈন্যদের তুমি অস্ত্র সরবরাহ করেছ কেন, জানতে পারি ?

ঈশ্বরঘোষ। ব্যবসায় জাতিভেদ মানে না, এই হচ্ছে একমাত্র আন্তর্জাতিকতা।

গোপালদেব। কিংবা বলতে পারতে, গৌড়ের সৈন্য গৌড়ের অস্ত্রেই

মরেছে, এই তাদের সান্ত্বনা। আর তুমি নাগভট্ট, মোটা সুদের খাতিরে গুর্জ্জর-রাজকে ঋণ দিয়েছিলে ?

নাগভট্ট। আমাদের লাভে কি গৌড়ের লাভ নয় ?

গোপালদেব। তুমিই গৌড়, তুমি, তুমি আর তুমি ! তোমরাই চেয়েছিলে গৌড়ে শান্তি, যাতে নিরুপদ্রবে গৌড়ের সর্ব্বনাশ করতে পার !

নাগভট্ট। শুধু শান্তি নয়, স্বাধীনতাও চেয়েছিলাম ; যা চেয়েছিলাম তার বেশি পেয়েছি। তুমি বাইরের শত্রুকে বিনাশ করেছ, কিন্তু তার বদলে গৌড়কে বাঁধছ পরাধীনতার নাগপাশে।

গোপালদেব। পরাধীনতাই বটে ! তোমরা কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ী মিলে গৌড়কে শাসন করতে চাও নিজেদের স্বার্থের জন্য, তাকেই বল তোমরা স্বাধীনতা ! শত্রুকে সরবরাহ করবে অস্ত্র, শত্রুকে দেবে ঋণ, অসম্ভব সুদে রাজকোষে ঋণ দিয়ে তাকে কবলিত ক'রে রাখবে' একে বল তোমরা স্বাধীনতা !

নাগভট্ট। আজ কি আবার নতুন আদেশ প্রচার করেছ ?

গোপালদেব। বড় অন্যায় করেছি ! তোমরা খাদ্যে মেশাবে ভেজাল, এই তোমাদের স্বাধীনতা ! রাজপথে আবর্জ্জনা ফেলে বায়ুকে করবে দূষিত, এই তোমাদের স্বাধীনতা !

নাগভট্ট। অন্তত এ সব রাজার হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

গোপালদেব। কেন ? রাজা লড়াই ক'রে দেশকে নিরাপদ ক'রে রাখবে তোমাদের স্বার্থসাধনের জন্য, কি বল ? তোমাদের মতে এই হচ্ছে রাজার কর্ত্তব্য !

ঈশ্বরঘোষ। এ সব কাজের জন্য তোমাকে নির্ব্বাচন আমরা করি নি।

গোপালদেব। ভুল করেছ। শোন, স্বাধীনতা দু রকমের—বাহ্

আর আভ্যন্তরীণ। এক দেশ যখন অন্য দেশকে জয় ক'রে ভোগ করে, তখন বলা যেতে পারে, সে দেশের বাহ্য স্বাধীনতা নেই। কিন্তু বাহ্য স্বাধীনতা থাকলেও দেশ পরাধীন হ'তে পারে, যেমন হয়েছে গৌড়। তোমরা কয়েকজনে মিলে গৌড়কে স্বার্থের সোনার শিকলে কবলিত ক'রে রেখেছ।

ঈশ্বরঘোষ। সোনার শিকল অন্তত লোহার শিকলের চেয়ে কঠিন নয়।

গোপালদেব। কে বললে, নয়? লোহার শিকল প্রতি মুহূর্ত্তে বন্দীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে বন্ধ; সোনার শিকলে বন্দী গৌরব অনুভব করতে শেখে; পায়ের বাধাকে সে ঐশ্বর্য্য ব'লে মনে করে। রাজকীয় পরাধীনতার চেয়ে ব্যবসায়িক পরাধীনতা ভীষণতর, কারণ তা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বানিজ্যবাদ অনেক বড় অভিশাপ। রাজদণ্ডের চেয়ে মানদণ্ড গুরুতর।

নাগভট্ট। আমাদের মিছে অপরাধী করছ।

গোপাদেব। না, অপরাধ তোমাদের নয়, মানুষমাত্রেই অপরাধী। মানুষের ইতিহাসে সেই সময় এসেছে, যখন প্রত্যেক দেশের পক্ষে বাহ্য স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কোন জাতিকেই এখনও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দেবার সময় আসে নি। মানুষ আজও নাবালক, তাকে এখনও হাতে ধ'রে শেখাতে হবে—পরের খাদ্যে ভেজাল দিও না, পথে আবর্জ্জনা ফেল না, রাতের বেলা চীৎকার করে প্রতিবেশীর শান্তি ভঙ্গ ক'র না। গৌড়ের, শুধু গৌড়ের কেন, জগতের এই দুর্দ্দিনে কোন্ স্বার্থ আমরা ত্যাগ করতে পারি, আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগন্য স্বাধীনতাকে দেশের জন্য বলি দিতে পারি! বলতে পারি, এই দিলাম আমার ব্যক্তিকে সমষ্টির মধ্যে বিসর্জ্জন! আমি বুঝতে পারছি, একথা তোমাদের

মনে হয় নি, হবার কথাও নয়, কারণ সবাই চিন্তা করতে পারে না। লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তো একজনেরও চিন্তাশক্তি নেই, সেইজন্য একজনকে অনেকের হয়ে চিন্তা ক'রে দিতে হয়। একজনে যখন দেশসুদ্ধ লোকের জন্য চিন্তা করে, আর তাই শুনে সবাই চলে, তাকেই বলে—গণতন্ত্র। [একটু থামিয়া] একটু নাটকীয় হয়ে গেল, নয় ?

ঈশ্বরঘোষ। কথাগুলো নতুন লাগল।

গোপালদেব। শুধু এখনকার পক্ষে নতুন নয়, আজ থেকে হাজার বছর পরেও গৌড়ে এ কথা নতুন ব'লে মনে হবে। [হঠাৎ গম্ভীরভাবে] নাগভট্ট, তোমাদের তিন জনকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছি, যথাসময়ে বিচার হবে।

মনিভদ্র তিন জনের দিকে তাকাইয়া চোখের ইঙ্গিতে কি বুঝিয়া লইল

মনিভদ্র। তবে আর বিলম্ব নয় গোপালদেব, তুমিই আমাদের বন্দী।

গোপালদেব মোটেই চিন্তিত বা বিচলিত হইল না ; অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কহিল

গোপালদেব। ও, এতক্ষণ তোমাদের এই আলোচনাই হচ্ছিল বুঝি ! [একটু থামিয়া] তা বেশ।

মণিভদ্র। নাগভট্ট, আমি চল্লাম কল্যাণবর্ম্মাদের বন্দী করবার জন্য। তোমরা আসবার আগে ভদ্রাকে ডেকে গোপালদেবকে তার জিম্মায় রেখে যাবে। তাকে বলবে, গোপালদেবের গায়ে হাত দেবার প্রয়োজন নেই, সে যেন ভদ্রার প্রাসাদ থেকে বের হ'তে না পারে, এবং কেউ যেন তার সঙ্গে দেখা করতে না পায়। আমি ওদের বন্দী ক'রেই ঘুরে আসব এখানে। তোমরা ভদ্রাকে ব'লেই এস, আমি চললাম।

দ্রুত প্রস্থান

গোপালদেব। ছোকরা খুব চটপটে, আমার অধীনে থাকলে ভাল সেনাপতি হ'তে পারত।

নাগভট্ট। ইন্দ্রদত্ত, নাও, তুমি ভদ্রাকে ব'লে ব্যবস্থা ক'রে এস।

ইন্দ্রদত্তের প্রস্থান

গোপালদেব। নাগভট্ট, পরশু যে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, দেখেছিলে?

নাগভট্ট। হ্যাঁ, পূর্ণগ্রাস—আমরা যথাশাস্ত্র স্নান দান করেছিলাম।

গোপালদেব। আমি সে কথা বলছি না; চন্দ্রগ্রহণের কারণ কি জান?

নাগভট্ট। কারণ আবার কি? রাহুতে গ্রাস করে।

গোপালদেব। বোধ হয় তা নয়; আর্য্যভট্ট নামে এক পণ্ডিত বলেছেন, চাঁদের ওপরে পৃথিবীর ছায়া প'ড়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

নাগভট্ট। ও সব ছেলেমানুষের কথা।

গোপালদেব। আমার তো মনে হয়, রাহুতে গ্রাস করবার কথাই ছেলেমানুষের কথা।

ইন্দ্রদত্তের প্রবেশ

নাগভট্ট। ইন্দ্রদত্ত, সব ব্যবস্থা যথাযথ হয়েছে?

ইন্দ্রদত্ত। হ্যাঁ। ভদ্রা তার প্রাসাদের দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বসিয়ে দিয়েছে, প্রাসাদের চারদিকেও পাহারা বসেছে।

নাগভট্ট। তবে চল, আমরা এবার যাই। মণিভদ্র তাড়াতাড়ি যেতে ব'লে গিয়েছে। গোপালদেব, পালাবার বৃথা চেষ্টা ক'র না।

গোপালদেব। পালাবার চেষ্টায় যে শক্তির ব্যয় হবে, তা অপব্যয় করবার মত নির্ব্বোধ আমি নই।

নাগভট্ট। এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। আমরা ফিরে এসে

তোমাকে তোমার প্রাসাদে নিয়ে যাব, অন্যত্র রেখে তোমাকে অপমান করব না।

গোপালদেব। একেবারে রাজভক্তি নেই, এমন বলতে পারি না।

নাগভট্ট প্রভৃতি তিন জনের প্রস্থান; গোপালদেব বুকে বাহুবদ্ধ হইয়া পায়চারি করিতে লাগিল; এমন সময় ভদ্রার এক ভৃত্য একটা ম্লানবেশী লোককে বলপূর্বক ঠেলিতে ঠেলিতে প্রবেশ করিল; লোকটা গাঁটকাটা; প্রাসাদের দ্বারের কাছেই গাঁট কাটিয়াছে

ভৃত্য। এই বেটা, বল, কোথায় পেলি?

গাঁটকাটা। অনেকবার তো বললাম, এবার তুমি বল যে, কি উত্তর শুনলে তুমি খুশি হও।

ভৃত্য। বেটা, পাঠশালায় পড়েছিলি না?

গাঁটকাটা। নইলে এ বিদ্যা শিখলাম কোথা থেকে?

গোপালদেব অগ্রসর হইয়া

গোপালদেব। কি হয়েছে?

উভয়ে। আরে, মহারাজ যে!

ভৃত্য। মহারাজ, লোকটা তস্কর। এই দেখুন, ওর কাছে চোরাই মাল পাওয়া গিয়েছে।

এই বলিয়া সে একটি মূল্যবান হার ও একখানি ভূর্জ্জপত্রের লিপি দেখাইল

গাঁটকাটা। মহারাজ, আপনি বিচারক, আমি তস্কর নই, তত বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই, আমি সামান্য গ্রন্থিচ্ছেদক মাত্র, অব্যবসায়ীরা ঘৃণা ক'রে বলে—গাঁটকাটা।

গোপালদেব। বুঝেছি বৎস, আর বলতে হবে না।

ভৃত্য। এখন কি করা যায় একে নিয়ে?

গোপালদেব। দেখি জিনিস ছুটো।

সে হার ও পত্র হাতে লইয়া হারটি ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিল ; চিঠিখানি পাঠ করিয়া নিজের কাছে রাখিল, তাহাকে কহিল

কার গ্রন্থিচ্ছেদন করলে বৎস ?

গাঁটকাটা। এক ধনী ব্যক্তি কিছুক্ষণ আগে এই প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছিলেন, আমার কৌশলী হাত তাঁর আংরাখার মধ্য থেকে—

গোপালদেব। বাকিটুকু বুঝেছি।

গাঁটকাটা। বুঝবেনই তো মহারাজ।

ভৃত্য। সে ব্যক্তি আর কেউ নয়—ঢেকুরের রাজা মণিভদ্র। আরে বেটা, সে মস্ত লোক, চুরি করতে গেলি কেন, চাইলে পেতিস না ?

গাঁটকাটা। দাদা, তুমি কখনও চুরি কর নি দেখতে পাচ্ছি।

ভৃত্য। দেখ, চোর বলিস নি।

গাঁটকাটা। কথাটা শুনেও শুনলে না ? চোর বললাম কোথায় ? ঠিক তার উল্টো বললাম যে! ধরা পড়বার পরে সবাই চোরকে ওই কথা বলে, চুরি করতে গেলি কেন, চাইলে পেতিস না ? যদি চাইলেই পাওয়া যেত, তবে দেশে এত ভিক্ষুক না খেতে পেয়ে ঘুরে মরত না।

গোপালদেব। বৎস, তুমি ব্যবসায় নির্ব্বাচনে ভুল করেছ ; গ্রন্থিচ্ছেদক না হয়ে তোমার দার্শনিক হওয়া উচিত ছিল।

গাঁটকাটা। আজ্ঞে, একেবারে দর্শনশক্তি না থাকলে কার আংরাখার মধ্যে কি আছে, কেমন ক'রে দেখতে পারি ?

গোপালদেব। [ভৃত্যের প্রতি] ওহে, ওকে তোমার গৃহস্বামিনীর কাছে নিয়ে যাও। এই ভূর্জ্জপত্রখানা আর নিয়ে কি করবে, ওটা আমার কাছেই রইল।

ভৃত্য। চল বেটা।

গাঁটকাটা। মহারাজ, এবার ছাড়া পেলে আপনার উপদেশ ভুলব না, আমার ভ্রান্ত প্রতিভা দর্শনশাস্ত্রে নিয়োগ করব।

গোপালদেব। বড় খুশি হলাম।

ভৃত্য লোকটাকে লইয়া পিছনের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল। গোপালদেব এমাথা ওমাথা পায়চারি করিতে লাগিল, এবং বার কয়েক চিঠিখানা পড়িয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিয়া দিল

পিছনের দ্বার দিয়া এক বাটি দুধ হাতে বল্লভার প্রবেশ; সে গোপালদেবকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল

বল্লভা। মহারাজ যে! আমাদের বুড়ো মেয়েটাকে দেখেছ? কখন থেকে খুঁজছি দুধটুকু খাওয়াবার জন্যে।

গোপালদেব। তুমি কে?

বল্লভা। আমি কে? তুমি চিনবে না মহারাজ, তোমার বাপ চিনত আমাকে, সেই যে বারে বড় ভূমিকম্প হয়, সেই বারে—

গোপালদেব। বুঝেছি, কাকে খুঁজছ?

বল্লভা। আমাদের ভদ্রাকে। বড় দুষ্টু মেয়ে, দুধ একেবারে খেতে চায় না।

গোপালদেব। সে এদিকে তো আসে নি।

বল্লভা। তবে বুঝি বাগানে গিয়ে পেয়ারাগাছে উঠল! অসুখ বাধালে, আর দেরি নাই। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

দ্রুত প্রস্থান

অন্য দ্বার দিয়া ভদ্রার দ্রুত প্রবেশ

ভদ্রা। গোপালদেব, তুমি তো নিত্য নতুন আদেশ প্রচার করছ, বল্লভার কোন একটা ব্যবস্থা করতে পার, ওর জ্বালায় তো আর পারি না।

গোপালদেব। বল্লভার মত আর কয়েকজন মেয়ে পেলে আমি গৌড়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতাম।

ভদ্রা। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সে সুযোগ তোমার ঘটল না মহারাজ, তুমি বন্দী।

গোপালদেব। সে রকম একটা খবর আমার কানে এসেছে। এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি, আমি কার বন্দী!

ভদ্রা। আপাতত আমার, যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা হয়।

গোপালদেব। কার কাছে বন্দী? তোমার কাছে?

ভদ্রা। আমার এবং আমার বন্ধুদের কাছে।

গোপালদেব। ওই যারা এসেছিল, তারা তোমার বন্ধু?

ভদ্রা। নিশ্চয়।

গোপালদেব। বন্ধুই বটে!

ভদ্রা। গৌড়ের স্বাধীনতার জন্য আমরা সন্ধির সূত্রে আবদ্ধ।

গোপলেদেব। শুধু গৌড়ের স্বাধীনতা নয়, তোমার স্বাধীনতাও যেন তাদের হাতে।

ভদ্রা। এ কথা কেন বলছ?

গোপালদেব। কারণ ঘটেছে। কিন্তু এখন আমাকে কি করতে হবে?

ভদ্রা। যতক্ষণ না মণিভদ্র তোমাকে নিতে আসে, অনুগ্রহ ক'রে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

গোপালদেব। মণিভদ্র তোমার বন্ধু?

ভদ্রা। এক সময় সে আমার শত্রু ছিল, এখন সে বন্ধু।

গোপালদেব। কেবলই কি বন্ধু? তার বেশি কিছু নয়?

ভদ্রা। গোপালদেব, তুমি যে কথার ইঙ্গিত করছ, তা তোমার মত অত্যাচারী রাজার পক্ষেও করা উচিত নয়।

গোপালদেব। আমি কোন ইঙ্গিত করি নি, তোমার বন্ধুরাই করেছে।

ভদ্রা। তুমি মিথ্যাবাদী।

গোপালদেব। আর্য্যে, আমি যে একেবারে মিথ্যা কথা বলি না, এমন নির্ব্বোধ আমি নই। তবে এ-কথাটা তোমার বন্ধুদের কাছ থেকেই জেনেছি। বোধ করি, প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস হবে না। এই নাও।

সে ভূর্জ্জপত্রখানা বাহির করিয়া ভদ্রাকে দিল।

ভদ্রা মনোযোগ দিয়া ভূর্জ্জপত্রপাঠ করিয়া

ভদ্রা। এ লিপি জাল।

গোপালদেব। আশা করি, বন্ধুদের স্বাক্ষর তোমার পরিচিত।

ভদ্রা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া

ভদ্রা। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, শত্রু—

গোপালদেব। না, বন্ধু।

ভদ্রা। আমাকে এইভাবে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করেছে!

গোপালদেব। বন্ধুদের সে অধিকার আছে। নয়?

ভদ্রা। আমাকে বাধ্য করবে মণিভদ্রকে বিবাহ করতে?

গোপালদেব। [ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে] দেশের জন্য কত লোকে কত স্বার্থত্যাগ করে, আর তুমি এতটুকু পারবে না? খুব নিদারুণ সর্ত্ত তো নয়।

ভদ্রা। [রুষ্টভাবে] তুমি কিছু বোঝ না।

গোপালদেব। তোমার মনের কথা অবশ্য বুঝি না, কিন্তু মণিভদ্রের বুঝতে পারছি।

ভদ্রা। পারবেই তো, সব পুরুষই এক রকম।

গোপালদেব। না ভদ্রা, সব রাজাই এক রকম। আমাকে অত্যাচারী বলছ, কিন্তু এরা রাজত্ব পাবার আগেই কি রকম করছে?

ভদ্রা। তুমি অত্যাচারী বটে, কিন্তু তুমিও এ রকম কাজ করতে পারতে না।

গোপালদেব। সে কথা ঠিক। কাঁচনে মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করা ছাড়াও অন্য কাজ আমার আছে।

ভদ্রা। দেখ কাঁচনে ব'ল না। [হঠাৎ সে যেন নূতন পথ দেখিতে পাইল] গোপালদেব, ওরা এসে পড়বার আগেই তোমাকে মুক্তি দেব।

গোপালদেব। [শান্ত স্বাভাবিক ভাবে] মুক্তি দেবে? গৌড়ের স্বাধীনতার তা হ'লে কি হবে?

ভদ্রা। যারা অসহায়, নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, তারা করবে দেশ স্বাধীন? আমি দ্বারের প্রহরী সরিয়ে নিচ্ছি, তুমি মুক্ত। শুধু বল যে, ওদের তুমি দণ্ড দেবে?

গোপালদেব। এই ঘটকালির জন্য?

ভদ্রা। হাঁ।

গোপালদেব। সে প্রতিজ্ঞা করতে পারি না।

ভদ্রা। আচ্ছা, সে প্রয়োজন নেই। তুমি অত্যাচারী হ'লেও বীর, তুমি কখনও নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করবে না।

গোপালদেব। না, সে সময় আমার নেই।

ভদ্রা। গোপালদেব, তুমি মুক্ত। এস আমার সঙ্গে।

উভয়ে যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে মণিভদ্রের দ্রুত প্রবেশ; সে ভদ্রার শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছে

মণিভদ্র। বিলম্ব হয়ে গিয়েছে ভদ্রা, আমি এসে পড়েছি।

ভদ্রা। তুমি কাপুরুষ। এই লিপি তোমাদের রচনা?

ভূর্জপত্র দেখাইল

মণিভদ্র। পেলে কোথায়? [আংরাখার মধ্যে হাত দিয়া দেখিল—

নাই ; বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল] ওঃ, তাই তো, গ্রন্থি-ছেদন হয়ে গিয়েছে !

ভদ্রা। তুমি কাপুরুষ।

মণিভদ্র। কাপুরুষ বইকি। প্রেম যে স্বভাবতই ভীরু। আমি এত বড় বীরপুরুষ যে, তোমাকে পাবার জন্য ভীরুতার গ্লানিও স্বীকার করেছি।

ভদ্রা। তুমি অবিশ্বাসী।

মণিভদ্র। প্রেম যে স্বভাবতই বিশ্বাসহীন।

ভদ্রা। তোমাদের মত কৃতঘ্নদের বন্ধুত্ব আমি অস্বীকার করছি, আমি গোপালদেবকে মুক্তি দিয়েছি।

মণিভদ্র। আমি আমার বন্ধুদের কাছে কৃতঘ্ন হ'তে পারি না, আমি তো গোপালদেবকে মুক্তি দিতে পারি না।

ভদ্রা। আমার প্রহরী সরিয়ে নিচ্ছি।

মণিভদ্র। আমার প্রহরী আছে। গোপালদেব, তোমার প্রাসাদে চল।

গোপালদেব। তথাস্তু।

ভদ্রা। আমি এখনই গিয়ে গৌড়ে রাষ্ট্র ক'রে দেব, তোমরা ষড়যন্ত্র করছ।

মণিভদ্র। যাবে কি ক'রে ? তোমার প্রাসাদে তুমি এখন বন্দী। তোমার প্রহরীদের তাড়িয়ে দিয়ে দরজায় এবার আমার প্রহরী বসবে। তারপরে সব মিটে গেলে, শুভলগ্নে --

ভদ্রা। চুপ কর।

মণিভদ্র। হুলুধ্বনির মধ্যে—

ভদ্রা। চুপ কর, চুপ কর।

মণিভদ্র। উৎসবের আনন্দধ্বনিতে—

ভদ্রা। চুপ কর কাপুরুষ।

মণিভদ্র। গৌড়ের নূতন রাজা নির্ব্বাচিত হবে। ততক্ষণ তুমি এখানে বন্দী। বাইরে যেতে বৃথা চেষ্টা ক'র না, লাঞ্ছিত হবে। চল গোপালদেব।

গোপালদেব। চল। ভয় নেই ভদ্রা, এবার থেকে আমি তোমার বন্ধু।

মণিভদ্র। আমি বহুদিন আগে থেকে তোমার বন্ধু, ভদ্রা।

ভদ্রা। ভদ্রা! আমার নাম ধ'রে ডেক না, বলবে—চন্দ্রসেনের কন্যা।

মণিভদ্র। [ব্যঙ্গ সম্মানের সঙ্গে] বিদায় চন্দ্রসেন কন্যা।

উভয়ের প্রস্থান

ভদ্রা শ্বেতপাথরের বসিবার স্থানে বসিয়া পড়িল; অপমানে, রাগে, ক্ষোভে, ভয়ে সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; শ্বেতপাথরের ঠেস দিবার স্থানের উপরে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে সুরু করিল; কেবল একটি কথা বোঝা গেল

ভদ্রা। আজ বুঝতে পারছি, আমার কেউ নেই।

বল্লভার প্রবেশ, হাতে চিরুনি, দর্পণ, কেশপ্রসাধনের উপকরণ

বল্লভা ওমা, এখানে ব'সে কি করা হচ্ছে? মেয়েটা কাঁচা পেয়ারা খেয়েই মরবে।

ভদ্রা। তুমি যাও বল্লভা।

বল্লভা। তুমি যাও, কেন যাব শুনি?

ভদ্রা। এখন আমার ভাল লাগছে না।

বল্লভা। ভাল লাগবে কেমন ক'রে? সারাদিন কাঁচা পেয়ারা খেলে কার ভাল লাগে শুনি?

ভদ্রা। তুমি বুঝবে না।

বল্লভা। বুঝি গো বুঝি, শুধু কাঁচা পেয়ারা নয়, কাঁচা বয়েস। হ্যাঁ ভদ্রা, বিয়ে করবি না?

ভদ্রা। সেই কথাই তো ভাবছিলাম।

বল্লভ। বলি, কাকে পছন্দ হ'ল এতদিনে?

ভদ্রা। গোপালদেবকে।

বল্লভ। না, সত্যি ক'রে বল, ঠাট্টা নয়।

ভদ্রা। সত্যি, ঠাট্টা নয়।

বল্লভা। বেশ হয়। গোপালদেবকে বিয়ে করলে, তুমি হবে গৌড়ের রাণী। সে বেশ হয় ভদ্রা; তা হ'লে আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। সেইজন্যেই বুঝি মহারাজ এসেছিল? কি বললে? সে বেশ হয় ভদ্রা!

ভদ্রা। কি যে বকছ!

বল্লভা। তা সত্যি। আমি বড্ড খুশি হয়েছি ভদ্রা।

ভদ্রা। খুশি হ'লেই হ'ল! সে কেন বিয়ে করতে যাবে?

বল্লভা। কেন যাবে না, শুনি? এ রকমটি আর পাবে কোথায়? রাজা হ'লেই রাণী জোটে না, রাণী জোটে ভাগ্যে। গোপালদেবের ভাগ্যি ভাল।

ভদ্রা। যাও, মেলা ব'ক না।

বল্লভা। আয় মা, চুলগুলো আঁচড়ে দিই।

ভদ্রা। [উঠিয়া পড়িয়া] না না, সে হবে না।

বল্লভা তাহাকে ধরিতে গেল, ভদ্রা ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে

চুল বাঁধতে পারবে না। ওটি হবে না বল্লভা।

প্রস্থান

বল্লভা। আচ্ছা, আজকের এতবড় সুসংবাদের জন্যে তোমার চুলবাঁধা মাপ। [দেখিল, ভদ্রা চলিয়া গিয়াছে] ওমা, এর মধ্যেই নেই? মেয়ে বটে!

পিছনের দ্বার দিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

ছ-দৃশ্য

সর্ব্বানন্দ বাবুর বাড়ি: চ-দৃশ্যের বর্ণিত কক্ষ; সময় অপরাহ্ণ; কক্ষ নির্জ্জন; রেডিও-সেটে বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে; রেডিওর বক্তৃতা যেমন শোনা যায় তেমনই শব্দগুলি ধীর-গতি কাটা-কাটা

রেডিও। নমস্কার। আজ আমরা একখানি নূতন নাটকের অভিনয় করব; এখানির নাম মোগল-মারাঠা; লেখক—বাণীকুমার চাটুজ্জে। দেশী এবং বিদেশী সমালোচকদের মতে মোগল-মারাঠা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক; এ রকম ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংঘাত, দরদ—শেক্সপীয়রের নাটকেও নেই; কালিদাসের শকুন্তলা ও গ্রীক নাটক এর কাছে তুচ্ছ; আমরা আশা করি বাণীকুমার চাটুজ্জে শীঘ্রই জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিগণিত হয়ে বঙ্গদেশের মুখ কলঙ্কিত—ইস্ [অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে] অলঙ্কৃত করবেন। আপনারা অবধান করুন।

দ্রুত সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। নাঃ, আর সহ্য হয় না! এই ডানা-কাটা টিয়া পাখীটার কান থাকলে আচ্ছা ক'রে মলে দিতাম।

সে রেডিওর চাবি বন্ধ করিয়া দিল, বেচারা যন্ত্রটা যন্ত্রণার অর্দ্ধোক্ত শব্দের আর্ত্তনাদ করিয়া থামিল

জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক ! জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সব বাংলা দেশে এসে জুটেছে ! এ দেশের ওষুধ মাত্রেই মহৌষধ ; পত্রিকা মাত্রেই মুখপত্র ; কবি মাত্রেই মহাকবি ; গিরিশ ঘোষ, যে লোকটা ছিল অদ্ধেক ভাঁড় অদ্ধেক ভক্ত, সে এ দেশের শেক্সপীয়র !

মণিময়বাবুর প্রবেশ

মণিময়। এই যে, সুভদ্রা দেবী !

সুভদ্রা। আসুন। টেলিগ্রাম পেলেন ?

মণিময়। এখনও পাই নি, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে। সে জন্যে চিন্তা কেন ?

সুভদ্রা। ইলেক্‌শনের ফল জানা দরকার।

মণিময়। তা টেলিগ্রাম এল ব'লে। কিন্তু আমি ব'লে রাখছি শুনুন, শ্রীমন্তবাবুর কোন আশা নেই, শতকরা আশীটা ভোট আমি পেয়েছি।

সুভদ্রা। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আপনি কাউন্সিলে গেলে একটা কাজ করবেন প্রতিশ্রুতি দিন।

মণিময়। হুকুম করুন।

সুভদ্রা। রেডিওর উপদ্রবে পথে-ঘাটে কান বাঁচিয়ে চলা দায়। একটা আইন ক'রে বাঙালীকে এই সাঙ্ঘাতিক কর্ণমর্দ্দন থেকে রক্ষা করবেন।

মণিময়। নিশ্চয় করব। আর যদি আইন ক'রে সম্ভব না হয়, তবে আমি পরশুরামের মত একুশ বার বাংলা দেশ রেডিওহীন করব।

সুভদ্রা। আর বাংলা দেশ কৃতজ্ঞ হয়ে সংবাদপত্রের হেড লাইনে আপনাকে উপাধি দেবে রেডিও-শহিদ।

মণিময়। শ্রীমন্তবাবুর খবর কি ?

সুভদ্রা। কি জানি! চলুন, আপনি যখন এত বড় একটা কাজ করতে প্রতিশ্রুত হলেন, আপনাকে চা না খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছি না।

মণিময়। মুস্কিল কি জানেন সুভদ্রা দেবী, করবার ইচ্ছে অনেক, কিন্তু সুযোগ মেলে না—এই তো জীবনের ট্র্যাজেডি।

সুভদ্রা। চলুন, বাকিটুকু চায়ের টেবিলে ব'সে শোনা যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

চক্রধরবাবু ও কল্যাণের অন্য দ্বারপথে প্রবেশ

চক্রধর। তা হ'লে আজই খবর পাওয়া যাবে ?

কল্যাণ। তাই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু শ্রীমন্ত হেরে গেলে বিপদ।

চক্রধর। বিপদ আবার কি ? মণিময়বাবু হোক, শ্রীমন্ত হোক, একজন হ'লেই হ'ল।

কল্যাণ। তা বটে, আপনি তো আর বিয়ে করছেন না।

শ্রীমন্তর প্রবেশ ; পরণে তার ট্রাউজার, গায়ে তার সিন্ধু-নীল রঙের কোর্ত্তা ; কোর্ত্তার বুকের উপরে লাল রেশমের মস্ত একটা ফুটবল আঁকা

এই যে শ্রীমন্ত, টেলিগ্রাম পেলে ?

শ্রীমন্ত। হুররে!

কল্যাণ। তা হ'লে খবর এসেছে।

শ্রীমন্ত। এখনও আসে নি, তবে আগাম জয়ধ্বনি ক'রে নিচ্ছি, তোমার হলধরবাবুর কোন আশা নেই। হুররে!

তাহার হর্ষধ্বনি শুনিয়া চায়ের টেবিল ফেলিয়া মণিময়বাবু, জগদম্বা ও সুভদ্রার প্রবেশ ; সকলেই বিভিন্ন কারণে চিন্তিত

মণিময়। খবর এসেছে ?

শ্রীমন্ত। এখনও আসে নি।

মণিময়। তবে চীৎকার করছেন কেন?

শ্রীমন্ত। খবর এলে আপনার পরাজয়কে উপেক্ষা ক'রে চীৎকার করা অশোভন হবে, তাই আগাম আনন্দ ক'রে নিচ্ছি।

মণিময়। শ্রীমন্তবাবু, আপনার আশা দুরাশা। ফুটবলকে সিম্বল ক'রে আপনি বাংলার নির্ব্বাচকদের মন ভোলাবেন? অসম্ভব।

জগদম্বা। তুমি বাবা একটা ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি এঁকে নিলেই পারতে।

শ্রীমন্ত। কোন চিন্তা করবেন না মাসিমা। তবে শুনুন, মণিময়বাবু, ফুটবলের মাহাত্ম্য আমি কেমন ক'রে শিখলাম। সেদিন ইংলণ্ডের পল্লী-অঞ্চলে গিয়েছিলাম বেড়াতে, হঠাৎ চোখে পড়ল এক পাল কুকুর আর এক পাল জাঁদরেল ইংরেজ বীর, তার মধ্যে কত লর্ড আছে, কত ভারি ভারি বীর আছে, সব ঘোড়ায় চেপে ছুটেছে। ভাবলাম, বোধ হয় বাঘ ভালুক শিকার করতে চলেছে। এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি, হাত খানেক এক খেঁকশিয়ালী প্রাণপণে ছুটেছে আর সেই সব বীর আর কুকুর তাকে তাড়া ক'রে ছুটেছে! ওঃ, সে কি অগ্রগতি! কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শিয়ালটার ওপরে গিয়ে প'ড়ে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। আর সকলে মিলে রুমাল ভিজিয়ে নিলে তার রক্তে। সেই দৃশ্য দেখে আমার মনের মধ্য দিয়ে শিয়ালের মত দ্রুতবেগে এক আইডিয়া ছুটে গেল।—কোন একটা নিরীহ বস্তুকে মধ্যস্থ না করতে পারলে মনুষ্যত্ব তেমন খোলে না। কোন দেশে সেটা শিয়াল, কোন দেশে ফুটবল। কোন ভয় নেই কল্যাণ, আমি জিতবই; বাংলা দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলী ফুটবলের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছে, তাদেরও মনুষ্যত্ব আছে।

বাড়ীর ভৃত্যের প্রবেশ ; হাতে একখানা টেলিগ্রাম

ভৃত্য। হুজুর, তার আয়া।

মণিময় ও শ্রীমন্ত। দেখি দেখি, এখানে দাও।

ভৃত্য কাহাকে দিবে ভাবিয়া পাইল না

কল্যাণ। আমি নিরপেক্ষ ব্যক্তি, আমিই খুলি।

সে টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িল

হুররে! হুররে!

মণিময় ও শ্রীমন্ত। কি ব্যাপার?

কল্যাণ। শ্রীমন্ত চ্যাটার্জি রিটার্নড উইথ হিউজ মেজরিটি।

সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক

শ্রীমন্ত। দেখলে তো ফুটবলের গুণ ; বাংলা দেশ কি কখনও ফুটবলকে অবহেলা করতে পারে?

মণিময়। উঃ, সব গেল! বৃথাই লাঙল ধরলাম! Roll up the map of Bengal for ten years! মাই গড্!

সে হঠাৎ পাশের একখানা আরাম-চেয়ারের উপরে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল, সকলে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল

জগদম্বা। মা গো, এ আবার কি হ'ল!

চক্রধর। মৃগী, না হিষ্টিরিয়া?

সুভদ্রা। ওরে, জল নিয়ে আয়।

কল্যাণ। পাখা! পাখা! ওরে, বরফ নিয়ে আয়।

শ্রীমন্ত। কি বিপদ! কল্যাণ, নাড়িটা দেখ তো।

কল্যাণ। বড় ভাল নয়। ডাক্তার! ডাক্তার! শ্রীমন্ত, মাথায় বাতাস কর।

জগদম্বা। আমার কেমন মাথাটা ঘুরছে।

কল্যাণ। আপনারা দুজনে এ ঘর থেকে যান।

সুভদ্রা। আমি ঠিক আছি।

কল্যাণ। আপনি খুড়িমাকে নিয়ে ও ঘরে যান।

সুভদ্রা। মা, চল।

কল্যাণ। আপনি ডাক্তার ডাকতে পাঠান। দূরে যাবার দরকার নেই, কাছ থেকে কাউকে ডেকে আনুক।

জগদম্বা। চল মা, ডাক্তার ডাকতে পাঠাই। ক'জন বাবা?

কল্যাণ। তাড়াতাড়ি যান। এক জন হ'লেই চলবে।

চক্রধর। না না, অন্তত দু'জন।

সুভদ্রা ও জগদম্বার প্রস্থান

কল্যাণ। ওহে, নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়।

শ্রীমন্ত। এঁর কিছু ভাল মন্দ হ'লে দায়িত্বটা শেষে আমার ঘাড়ে পড়বে।

চক্রধর। তোমার দোষ কি?

কল্যাণ। শ্রীমন্ত, মাথায় বাতাস দাও। ভদ্রলোক বড় শক পেয়েছেন।

তখন শ্রীমন্ত মাথায় বাতাস দিতে লাগিল, কল্যাণ জল দিতে লাগিল, আর চক্রধরবাবু হিষ্টিরিয়া-রোগীর মত ঘরময় দাপাদাপি করিয়া কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তাহা জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগিলেন

চক্রধর। আমি কি করব বলুন?

কল্যাণ। আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন।

চক্রধর। ঠিক বলেছ, বিপদকালে ধৈর্য্য নষ্ট করা কিছু নয়।

কল্যাণ। নাড়ীর গতিক ভাল নয়।

চক্রধর। তবে? কি করা যায়? ডাক্তার এল?

কল্যাণ। এল ব'লে।

চক্রধর। এক জন ডাক্তারে কি করবে? অন্তত দু জন চাই।

কল্যাণ। দু জনে কি হবে?

চক্রধর। তবে কি তিন জন? দাঁড়াও, আমি ব'লে আসি।

কল্যাণ। না না, তিন জনের দরকার নেই।

চক্রধর। তবে দু জনের কথাই ব'লে আসি।

দ্রুত প্রস্থান

শ্রীমন্ত। দু জন ডাক্তারই দরকার, এক জন এ'র জন্যে, আর এক জন চক্রধরবাবুর জন্যে।

চক্রধরবাবুর প্রবেশ

চক্রধর। দু দিকে দু জন গেছে, এল ব'লে দু জন ডাক্তার। কিন্তু আমি এখন কি করি?

কল্যাণ। আপনি স্থির হয়ে বসুন, ধৈর্য্য হারাবেন না।

চক্রধর। ঠিক বলেছ। বিপদকালে মাথা ঠিক রাখাই আসল কাজ।

কিন্তু তিনি বসিলেন না

এমন সময়ে দুই দিকের দুই দরজা দিয়া ভৃত্যের সঙ্গে দুই জন ডাক্তার প্রবেশ করিল; একজন ডাক্তার রোগা, লম্বা, মুখে কণ্টকিত দাড়ি-গোঁফ, কোর্ত্তার হাতায় ও ঘাড়ের কাছে সুতা বাহির করা, জুতা জোড়ায় অনেক দিন কালি পড়ে নাই, পকেটে বা অন্য কোথাও ষ্টেথোস্কোপ আছে বলিয়া মনে হয় না; নাম—পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য্য, লোকটা ঘোড়ার ডাক্তার

অন্য জনের নাম চন্দ্রগুপ্ত সেন; লোকটা স্থূলকায়, মুখখানি গোল, মাথায় টাক, কেবল কপালের নিকটে মাথার সম্মুখভাগে একমুঠা চুল আছে, পরণের কোর্ত্তা ও ট্রাউজার মূল্যবান, পকেটে ষ্টেথোস্কোপ, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি

এই যে ডাক্তারবাবু! আপনারা ৬ জন এসেছেন ভালই হয়েছে। বড় কঠিন রোগ।

পৃথ্বীরাজ। ওঁর অসুখ বুঝি? একটা sudden shock পেয়েছেন।

চক্রধর। ঠিক ধরেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। Partial paralysis of the nervous system—সাময়িক-ভাবে স্নায়ুজাল অসাড় হয়ে পড়েছে।

চক্রধর। এখন যা হয় করুন।

চন্দ্রগুপ্ত। কোন ভয় নেই। আমরা একটু কন্‌সাল্ট ক'রে নিই। আপনারা একটু ও ঘরে গেলে ভাল হ'ত।

চক্রধর। চলুন যাওয়া যাক. দরকার হ'লে ডাকবেন।

চক্রধর, শ্রীমন্ত ও কল্যাণের প্রস্থান

পৃথ্বীরাজ। ইস, বড্ড শক পেয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়?

চন্দ্রগুপ্ত। ঘোড়া? ঘোড়া কিসের?

পৃথ্বীরাজ। অনেক সময়ে কুকুরেও হ'তে পারে, কিন্তু ঘোড়া ছাড়া এমন শক হয় না।

চন্দ্রগুপ্ত। ঘোড়া? আপনি বলছেন ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে—

পৃথ্বীরাজ। না, ঘোড়াটাই বোধ হয় প'ড়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। আপনি কি—

পৃথ্বীরাজ। আমি ঘোড়ার ডাক্তার, বেলগাছিয়া ভেটারনারি স্কুল থেকে পাস।

চন্দ্রগুপ্ত। ও বুঝেছি।

পৃথ্বীরাজ। আপনি?

চন্দ্রগুপ্ত। আমার ফাদার ডাক্তার ছিলেন।

পৃথ্বীরাজ। আপনি শিখলেন কোথায়?

চন্দ্রগুপ্ত। সব শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যেখানে আয়ত্ত হয়—হোম ইউনিভার্সিটিতে। আমার ফাদার মৃত্যুর সময়ে আমাকে তাঁর ষ্টেথোস্কোপটা দিয়ে গিয়েছিলেন ; সেটার খাতিরে কিছু কিছু শিখে নিয়েছি।

পৃথ্বীরাজ। পসার হয়েছে ?

চন্দ্রগুপ্ত। বলেন কি ! আমার ডাক্তারখানার দু পাশে দু জন নামকরা এম. বি. আছে, তারা একটা রোগী পায় না, সব ঝুঁকে পড়ে আমার কাছে।

পৃথ্বীরাজ। কি আশ্চর্য্য ! লোকের কি তবে সায়েন্সের ওপর বিশ্বাস নেই !

চন্দ্রগুপ্ত। সায়েন্সের ওপরে বিশ্বাস আছে, তবে মাদুলির ওপরে বিশ্বাস আরও বেশি। আমি মাদুলিরও কারবার করি।

পৃথ্বীরাজ ! আই সী !

চন্দ্রগুপ্ত। এখনও সব দেখেন নি—সেই দু জন এম বি. আমার কাছ থেকে মাদুলি নিয়ে ধারণ করেছেন।

পৃথ্বীরাজ। রোগ সারাবার জন্যে ?

চন্দ্রগুপ্ত। না, পসার বাড়াবার জন্যে।

পৃথ্বীরাজ। ঘোড়ার মড়ক লাগে—এমন কোন মাদুলি আছে আপনার জানা ?

চন্দ্রগুপ্ত। যাবেন আমার কাছে এক সময়ে। এখন আসুন, কন্‌সাল্ট করা যাক।

পৃথ্বীরাজ। Kindly দেখুন—দরজার বাইরে লোকজন কেউ কান পেতে আছে কি না।

চন্দ্রগুপ্ত দেখিয়া আসিল

চন্দ্রগুপ্ত। না।

পৃথ্বীরাজ। ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিকে কেউ নেই তো?

চন্দ্রগুপ্ত দেখিয়া লইল

চন্দ্রগুপ্ত। না। এবার আসুন, কন্‌সাল্ট করা যাক।

পৃথ্বীরাজ। উঁহু, একবার ভাল ক'রে রোগীকে ঠেলেঠুলে দেখুন, জ্ঞান-ট্যান আছে কি না।

চন্দ্রগুপ্ত রোগীকে ঠেলিয়া দেখিল

চন্দ্রগুপ্ত। একেবারে বেহুঁস।

পৃথ্বীরাজ। বসুন একবার। আচ্ছা, আপনার নামটি?

পরস্পর কার্ড বিনিময় করিল

ডক্টর সেন। এর একটা যে কিছু রোগ হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

চন্দ্রগুপ্ত। নইলে আর আমাদের ডাকে।

পৃথ্বীরাজ। কি হ'তে পারে—আপনার বিশ্বাস?

চন্দ্রগুপ্ত। খানিকটা ব্লাড একজামিনের জন্যে পাঠালে হ'ত না? ডক্টর মুখার্জি আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁকে আমি অনেক দিন থেকে promise করেছি; তিনিও আমাকে অনেকবার sputum পাঠিয়েছেন।

পৃথ্বীরাজ। সে পরে হবে। এখন রোগটা কি অনুমান করুন।

তখন দুই জনে ডাক্তারী-বিদ্যার রিলে-রেস আরম্ভ করিল

চন্দ্রগুপ্ত। ম্যালেরিয়া।

পৃথ্বীরাজ। মেনিন্‌জাইটিস।

চন্দ্রগুপ্ত। টাইফয়েড।

পৃথ্বীরাজ। টি. বি.।

চন্দ্রগুপ্ত। নিউর‍্যালজিয়া।

পৃথ্বীরাজ। ব্রেন ফিভার।

চন্দ্রগুপ্ত। রিউম্যাটিজ্‌ম।

পৃথ্বীরাজ। পার্নিশাস অ্যানিমিয়া।

চন্দ্রগুপ্ত। ইনফ্লুয়েঞ্জা।

পৃথ্বীরাজ। অ্যাপোপ্লেক্সি।

চন্দ্রগুপ্ত। এপিলেপ্সি।

পৃথ্বীরাজ। ব্লাড-প্রেশার।

চন্দ্রগুপ্ত। সানস্ট্রোক।

পৃথ্বীরাজ। সমস্ত রোগের সঙ্গেই এর অবস্থা মিলে যাচ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত। সেই তো হয়েছে মুস্কিল।

পৃথ্বীরাজ। এক কাজ করা যাক, দাঁড়ান। [একটু ভাবিয়া] আচ্ছা, আমার এই আঙুল দুটোর মধ্যে একটা ধরুন।

দুইটি আঙুল দেখাইল। চন্দ্রগুপ্ত একটি আঙুল ধরিল

বাই জোভ ! ঠিক হয়েছে, ও সব কিছুই নয়। ডিস্‌পেপ্‌শিয়া। আমি ডিস্‌পেপ্‌শিয়া আর মেনিন্‌জাইটিসের মধ্যে চান্স নিয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। এখন ওষুধ কি ?

পৃথ্বীরাজ। ওষুধও বলছি।

চন্দ্রগুপ্ত। মনে না পড়ে আবার আঙুল ধরুন না।

পৃথ্বীরাজ। ওষুধ মনে পড়েছে। একদিন বাসে যাবার সময়ে কয়েকজন লোকের কথাবার্ত্তায় কানে এসেছিল যে, চুনের জল ডিসপেপশিয়ার বেস্ট মেডিসিন।

চন্দ্রগুপ্ত। অল্ রাইট। ছেলেবেলা দেখেছি, পেট ফাঁপলে মা চুনের জল খেতে দিত।

পৃথ্বীরাজ। তা হ'লে একবার ডাকা যাক।

চন্দ্রগুপ্ত। আশা করি রোগী আমাদের এই বৈজ্ঞানিক কন্‌সাল্টেশন শোনে নি। [বাহিরের দিকে] দেখুন, কে আছেন ?

চক্রধর, শ্রীমন্ত ও কল্যাণের প্রবেশ

চক্রধর। কি রোগ স্থির হ'ল ?

পৃথ্বীরাজ। সে লে-ম্যানের পক্ষে শোনা নিষ্প্রয়োজন। একে এখনই চুনের জল খাওয়াতে হবে।

চক্রধর। চুনের জল পাওয়া যায় কোথায় ?

পৃথ্বীরাজ সুভদ্রার ষ্ট্যাচুটার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল

পৃথ্বীরাজ। এটাকে গুঁড়ো ক'রে খাওয়ানো যায় না ?

চন্দ্রগুপ্ত। দিস্ উইল ডু।

শ্রীমন্ত। না না, ওটার দরকার নেই। তার চেয়ে এই নিন।

এই বলিয়া প্লাষ্টার-অব প্যারিসে পূর্ণ পাত্রটা অগ্রসর করিয়া দিল

পৃথ্বীরাজ। মাই গুড্‌নেস! এক্‌সেলেণ্ট! এতেই চলবে। রুগী ইমিডিয়েট রিলিফ পাবে। আসুন ডক্টর সেন, ওষুধটা তৈরী করা যাক। খানিকটা জল আর একটা পাত্র দিন তো।

কল্যাণ পাত্র আর জল আনিয়া দিল ; তখন দুই জন ডাক্তারে মিলিয়া প্ল্যাষ্টার তরল করিয়া গুলিয়া পাত্রে ঢালিয়া রোগীকে পান করাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা মুখের মধ্যে না ঢুকিয়া বাহিরে পড়িয়া যাইতে লাগিল

চন্দ্রগুপ্ত। এ তো হচ্ছে না, পেটে কিছুই যাচ্ছে না।

পৃথ্বীরাজ। [কল্যাণের প্রতি] দেখুন, তেল ঢালবার ফানেল আছে ?

কল্যাণ। ফানেল থাকা অসম্ভব নয়। দাঁড়ান দেখছি।

তাহার প্রস্থান ও একটি ফানেল লইয়া প্রবেশ

এই নিন।

পৃথ্বীরাজ। দ্যাট্‌স্ ইট।

তখন ফানেলটি রোগীর মুখে লাগাইয়া তরল ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া হইল

গো অন।

চন্দ্রগুপ্ত। অনেকটা হয়েছে। আর দরকার নেই।

পৃথ্বীরাজ। অল রাইট। বাস, মিনিট পনেরো পরে দেখবেন, রুগী সেরে উঠেছে।

চক্রধর। আপনারা তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যান।

পৃথ্বীরাজ। সার্টেন্‌লি। আমরা সহজে যাচ্ছি না। আমি এর খানিকটা ব্লাড নেব।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি নেব স্পিউটাম।

শ্রীমন্ত। [যেন নিজের মনেই] এদের পরিচয় না জানলে হঠাৎ রাক্ষস ব'লে মনে হ'ত।

কল্যাণ। এ ঘরে গোলমাল হবে, ওঁকে সরিয়ে অন্য ঘরে রাখা যায় না?

পৃথ্বীরাজ। সেই তো ভাল হবে—আমরাও সেখানে ব'সে ওঁকে অব্জার্ভ করতে পারব।

কল্যাণ। এই, কে আছিস?

দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ

তোরা চেয়ার ধ'রে মণিময়বাবুকে বড় বৈঠকখানায় নিয়ে যা তো।

তখন ভৃত্যেরা চেয়ার ধরিয়া মণিময়বাবুকে বহন করিয়া লইয়া গেল, সঙ্গে দুইজন ডাক্তার ও চক্রধর বাবু গেলেন

শ্রীমন্ত। যাক, একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

কল্যাণ। এখনও কাটে নি, ডাক্তারেরা রয়েছে।

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। মণিময়বাবুর অবস্থা কেমন ?

কল্যাণ। ডাক্তারেরা বলছেন, মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। গোলমালে তোমাকে কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ জানানো হয় নি শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। নেভার মাইণ্ড। ঠিক হয়েছে।

সুভদ্রা। ঠিক তো হ'ল, কিন্তু এমন মিরাক্‌ল সম্ভব হ'ল কি ক'রে ?

শ্রীমন্ত। তা হ'লে আবার আমাকে বত্রিশ সিংহাসনের ওপর উঠে দাঁড়াতে হ'ল। দাঁড়াও, সেটা ওঘরে আছে, নিয়ে আসছি।

কল্যাণ। তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, তুমি ব'স আমি নিয়ে আসছি।

শ্রীমন্ত। ধন্যবাদ।

কল্যাণের প্রস্থান

সুভদ্রা। ইউ আর মাই হিরো। এমন অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলা আর কারও দ্বারা হ'ত না। তোমার মধ্যে কোথায় অজেয় বীরত্ব লুকিয়ে আছে তাকে বিকশিত ক'রে তোল—দেশের মঙ্গল হবে।

শ্রীমন্ত। তুমি একে বীরত্ব বলছ—এই নির্ব্বাচকদের কাছ থেকে ভোট আদায় করাকে ?

সুভদ্রা। নয় তো কি ?

শ্রীমন্ত। এটা একটা ট্রিক, চালাকি, ধাপ্পাবাজিও বলতে পার।

সুভদ্রা। না, এ আমি বিশ্বাস করি নে। লোকে তোমাকে চিনতে পেরেছে ব'লেই ভোট দিয়েছে।

শ্রীমন্ত। লোকে চিনতে পারে নি ব'লেই আমাকে ভোট দিয়েছে।

সুভদ্রা। ও কেবল তোমার বিনয়। লোকে তোমাকে অসাধারণ ব'লে বুঝতে পেরেছে।

শ্রীমন্ত। লোকে অসাধারণ ব'লে বুঝতে পারলে কেউ আমার সাহায্যের জন্য এগোত না। বুঝলে সুভদ্রা, সাধারণ লোকে বীরত্ব, আদর্শ, মহত্ত্ব, অসাধারণত্ব—এসব পদার্থকে বড় ভয় করে, কারণ জগতের দুঃখের মূলে এরাই।

সুভদ্রা। [নিতান্ত বিস্মিত বিষণ্ণ ভাবে] কি বলছ ?

শ্রীমন্ত। তারা চায় সাধারণ লোককে, তারা চায় কৌশলকে, তারা চায় ছলনাকে। তারা পাথরের মূর্ত্তিকে ভয় করে ; তারা চায় মাটির পুতুল, যাকে চাপ দিয়ে ইচ্ছামত গ'ড়ে নিতে পারে।

সুভদ্রা। তবে কি পাথরের অমোঘ ব্যক্তিত্ব তোমাতে নেই ?

শ্রীমন্ত। একদম নেই। ওরা বুঝতে পেরেছে, আমি মাটির পুতুল, একেবারে বাংলা দেশের নরম মাটির। ওরা বুঝতে পেরেছে, আমার ইচ্ছা ওদের ইচ্ছারই রূপান্তর।

সুভদ্রা। [ক্লান্ত ক্লিষ্ট ভাবে] ভগবান !

এমন সময়ে কল্যাণ বাক্সটি লইয়া প্রবেশ করিল, সঙ্গে চক্রধরবাবু

কল্যাণ। রোগীর ওখানে একটু বিলম্ব হ'ল।

শ্রীমন্ত। ভদ্রলোক আছেন কেমন ?

চক্রধর। ডাক্তারেরা বলছে, ভয়ের কোন কারণ নেই।

কল্যাণ। চক্রধরবাবু, বসুন। শ্রীমন্ত এবার বলবে, কি ক'রে সে ইলেক্‌শনের দুস্তর সাগর ফুটবলে ক'রে পার হ'ল।

সকলে বসিল ; শ্রীমন্ত কেরাসিন-কাঠের বাক্সটার উপরে উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল

শ্রীমন্ত। আপনারা আমার সম্মুখে এসে বসুন, যাতে মনে করতে পারি—আপনারা আমার নির্ব্বাচকমণ্ডলী।

চক্রধরবাবু ও কল্যাণ সম্মুখে আসিয়া বসিল

সুভদ্রা, তুমি—

সুভদ্রা। আমি এখানে বেশ আছি।

সে পিছনের দিকেই বসিল

শ্রীমন্ত। আচ্ছা, এবার আমি আপনাদের সম্বোধন ক'রে আরম্ভ ক'রি। প্রথমেই লক্ষ্য করবেন, কি ব'লে আমি তাদের সম্বোধন করেছিলাম—ভাই খেলোয়াড়গণ, ভগ্নী খেলোয়াড়নীগণ! জীবনটা কর্ম্মক্ষেত্র নয়, সংগ্রামক্ষেত্র নয়; এমন কি রঙ্গমঞ্চও নয়, জীবন হচ্ছে ফুটবল খেলার মাঠ। ভগবান সৃষ্টি করেছেন মানুষ, মানুষ সৃষ্টি করেছে ফুটবল। খেলাই হচ্ছে বিশ্বের বিধান। কাজেই play is our birth-right।

যে সব ইলেক্‌শন-প্রার্থী তোমাদের কাজের কথা বলেছে, তারা ভ্রান্ত, তারা শিশু; না, তারা বৃদ্ধ। খেলার মাঠে আবার কাজ কি? এখানে শুধু খেলা, আর খেলা দেখা। এখানে শুধু ফুটবলে সজোরে লাথি, চটপটাপট হাততালি, আর ব'সে ব'সে চানাচুর চিনেবাদাম খাওয়া। এ খেলার আদি নেই, অন্ত নেই, ফাউল নেই, অফ্‌সাইড নেই, আরম্ভ নেই, কাজেই শেষও নেই।

ভাই খেলোয়াড় ও ভগ্না খেলোয়াড়নীগণ, তোমরা যদি আমাকে কাউন্সিলে পাঠাও, তবে আমি ফুটবল খেলাকে চিরস্থায়ী ক'রে দেব। দেখবে, এক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের রূপ বদলে যাবে। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, ইস্কুল নেই, কলেজ নেই, আপিস নেই, আদালত নেই, কেবল খেলা আর খেলা। সে খেলাও আবার মিশ্র খেলা, স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে। একেই বলে সত্যিকারের কো-এডুকেশন। আমি এ সমস্ত করব, তোমরা কেবল কষ্ট ক'রে আমাকে ভোটগুলো দাও।

এই সময়ে সুভদ্রা উঠিয়া প্রস্থান করিল; শ্রীমন্ত দেখিতে পাইল না

কেমন লাগছে কল্যাণ ?

কল্যাণ। খুব নতুন।

শ্রীমন্ত। বুঝলে হে, আমার নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই কথা শুনে আমাকে গিয়ে ভোট দিয়ে এল, আমি পেলাম শত-করা নিরেনব্বইটা ভোট।

চক্রধর। কি সর্ব্বনাশ!

শ্রীমন্ত। সর্ব্বনাশ আবার কিসের? যারা নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে কাজের কথা বলে, তারা নির্ব্বোধ। জনসাধারণ বালকমাত্র, তারা কাজের কথা শুনলে পিছিয়ে যাবে—এ তো অত্যন্ত স্পষ্ট।

চক্রধর। এ তো আমাদের খেয়াল ছিল না!

শ্রীমন্ত। থাকবে কি করে? আপনারা তো আর রাষ্ট্রসঙ্ঘে শিক্ষানবিশি ক'রে আসেন নি।

জগদম্বা দেবীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ

জগদম্বা। তোমরা কি বলেছ?

সকলে। কেন? কি হয়েছে?

জগদম্বা। সুভো কাঁদতে আরম্ভ করেছে; বলছে, আমি শ্রীমন্তকে বিয়ে করব না।

চক্রধর। কি সর্ব্বনাশ!

কল্যাণ। কেন?

জগদম্বা। অত কি আমি বুঝি? কেবল বলছে, শ্রীমন্ত নাকি চালাকি ক'রে জিতেছে।

শ্রীমন্ত। কি বিপদ!

জগদম্বা। [শ্রীমন্তকে] তুমি একটু চল তো বাবা।

শ্রীমন্ত ও জগদম্বার প্রস্থান

চক্রধর। কল্যাণবাবু, মেয়েদের বিয়ে দেবার ভার পুরুষ যে কেন নিতে গেল জানি নে। দেখুন, এখন কি বিপদ।

কল্যাণ। এর চেয়ে পুরাকালের মৎস্যচক্র-ভেদ, ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি পণ অনেক সহজ ছিল।

চক্রধর। পরিহাস নয়। এখন কি করি বলুন?

কল্যাণ। দেখুন না, কি হয়।

চক্রধর। একটা বিপদ হবেই। ও মেয়ে বড় একরোখা, যখন বেঁকে বসেছে, শ্রীমন্তকে আর বিয়ে নিশ্চয়ই করবে না।

কল্যাণ। সুভদ্রার অত্যন্ত অন্যায়।

চক্রধর। মাঝ থেকে আমার একটা দুর্নাম হবে।

বিমর্ষভাবে শ্রীমন্তর প্রবেশ

কল্যাণ। কি হ'ল?

শ্রীমন্ত। আমাকে সে বিয়ে করবে না।

কল্যাণ। কেন?

শ্রীমন্ত। আমি নাকি কেবল ট্রিক অর্থাৎ চালাকি ক'রে জিতেছি, এর মধ্যে কোন পৌরুষ বা বীরত্ব নেই।

চক্রধর। দেখ, মত ঘুরে যেতে পারে।

শ্রীমন্ত। সে অসম্ভব।

চক্রধর। আমি একবার ব'লে দেখি।

প্রস্থান

শ্রীমন্ত। উনি বলতে গেলেন যান, কিন্তু ওর মত আর ঘুরবে না। ওঃ কি ভুলই করেছি!

বসিয়া পড়িল

কল্যাণ। ভুলটা কি হে?

শ্রীমন্ত। আমি মন্ত্রীমণ্ডলীতে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে'ছিলাম। এখন আর একবার শেষ-চেষ্টা ক'রে দেখি, নতুন মন্ত্রীমণ্ডলীতে ঢুকে পড়া যায় কি না।

কল্যাণ। তুমি ঢুকবে মন্ত্রীমণ্ডলীতে ?

শ্রীমন্ত। বিস্মিত হচ্ছ কেন ?

কল্যাণ। হব না ? তুমি নির্ব্বাচনের প্রতিজ্ঞা ভেঙেছ ?

শ্রীমন্ত। না।

কল্যাণ। দেশের বিশ্বাস ভেঙেছ ?

শ্রীমন্ত। না।

কল্যাণ। ব্যাঙ্কের তহবিল ভেঙেছ ?

শ্রীমন্ত। না।

কল্যাণ। প্রতিপক্ষের মাথা ভেঙেছ ?

শ্রীমন্ত। না।

কল্যাণ। তবে তোমার আশা নেই।

শ্রীমন্ত। তৎসত্ত্বেও আছে। আমি বাঙালীকে চিনি। গুড-বাই।

সে কেথাসিন-কাঠের বাক্সটি লইয়া প্রস্থান করিল। জগদম্বা ও চক্রধরবাবু প্রবেশ করিলেন

চক্রধর। শ্রীমন্ত চলে গিয়েছে নাকি ?

কল্যাণ। হাঁ, কি হ'ল ?

চক্রধর। সে বলছে, শ্রীমন্তকে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল বীর ভেবে। তার বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারলে যে, সে কৌশলী—বীর নয়। বলছে, কৌশলীকেই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে সবচেয়ে বড় কৌশলীকেই বিয়ে করবে।

কল্যাণ। কাকে ? প্রফেসার গণপতিকে নাকি !

জগদম্বা। কি জানি বাবা ! আমার এখন মরণ হ'লে হয়।

কল্যাণ। আপনারা বসুন, আমি একবার বুঝিয়ে আসি।

প্রস্থান

জগদম্বা। আমার গা মাথা ঘুরছে।

চক্রধর। পাখাটা খুলে দিই। এখনই ঠিক হয়ে যাবে।

পাখা খুলিয়া দিল

জগদম্বা। উকিলবাবু, এখন আমার মরণ হ'লে বাঁচি।

চক্রধর। কিন্তু তাতেও আমার সমস্যার সমাধান হবে না।

জগদম্বা। আপনার দোষ কি? আপনি উইলমত কাজ ক'রে যান। যেমন বাপ, তেমনই মেয়ে হবে তো।

চক্রধর। কিন্তু লোকে আমাকে কি বলবে?

জগদম্বা। আমাকেও তো বলতে ছাড়বে না। উঃ, বুকের মধ্যে ধপ ধপ করছে।

চক্রধর। চলুন আপনি, ও ঘরে চলুন। না না, একলা যাবেন না, প'ড়ে যেতে পারেন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি। কোন ভয় নেই, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দুই জনের প্রস্থান

কথা বলিতে বলিতে কল্যাণ ও সুভদ্রার প্রবেশ

কল্যাণ। অবশেষে আপনার নির্ব্বাচন যে আমার ওপরে পড়েছে, সে জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি; কিন্তু কারণটা জানতে পারি?

সুভদ্রা। শ্রীমন্তবাবুকে বীরপুরুষ মনে করেছিলাম, কিন্তু তিনি যে ভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, শুনে বুঝলাম তিনি কৌশলী। আবার সে কৌশলও অসামান্য এমন কিছু নয়, হীন চালাকি মাত্র; সাদা কথায় তাকে বলে—লোক ঠকানো।

কল্যাণ। বুঝলাম।

সুভদ্রা। কৌশলীকেই যদি বিবাহ করতে হয়, তবে আপনার চেয়ে বড় কৌশলী আর কে আছে? আপনি তাসের যাদুকর।

কল্যাণ। সুভদ্রা দেবী, নিজের এমন অভাবিতপূর্ব্ব সৌভাগ্যে যে পরিমাণ আনন্দিত হওয়া উচিত তা হতে পারছি না।

সুভদ্রা। কেন?

কল্যাণ। শ্রীমন্তর ট্র্যাজেডি স্মরণ ক'রে।

সুভদ্রা। ওঃ, বন্ধুপ্রীতি?

কল্যাণ। না, আত্মপ্রীতি।

সুভদ্রা। সে আবার কি?

কল্যাণ। তবে খুলেই বলি। বিয়ের পরে ট্র্যাজেডি হওয়ার চেয়ে আগে হওয়া অনেক ভাল।

সুভদ্রা। ট্র্যাজেডি কিসের?

কল্যাণ। সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি। আপনি আমাকে যাদুকর ঐন্দ্রজালিক মনে ক'রে যে গৌরব দিচ্ছেন, বাস্তবিক আমি তার যোগ্য নই।

সুভদ্রা। কি রকম?

কল্যাণ। আমি শ্রীমন্তবাবুর চেয়েও হীনতর ধরণের চালাকি ক'রে থাকি মাত্র।

সুভদ্রা। কি সর্ব্বনাশ!

বসিয়া পড়িল

কল্যাণ। শ্রীমন্ত করে কথার চালাকি, তাতে লোক ঠকে; আমি করি হাতের চালাকি, তাতেও লোক ঠকে। আমার তাসের ইন্দ্রজাল অতি হীন ধরণের হাত-সাফাই ছাড়া আর কিছু নয়।

সুভদ্রা। কি বলছেন আপনি?

কল্যাণ। যা সত্যি তাই বলছি। তাসের ইন্দ্রজাল শেখা এতই সহজ যে, ইচ্ছা করলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আপনিও শিখতে পারেন।

সুভদ্রা। না, আমি শিখতে চাই নে।

কল্যাণ। তবেই বুঝুন, ওটা কত তুচ্ছ যে, আপনার শিখতেও আপত্তি আছে।

সুভদ্রা। আপনি সত্যি বলছেন, তাসের খেলায় ইন্দ্রজাল নেই— কেবল হাতের চালাকি?

কল্যাণ। ইন্দ্রজাল মানেই হাতের চালাকি।

সুভদ্রা। মাগো! কি ভুলই না আমি করেছি!

দ্রুত প্রস্থান

চক্রধরবাবুর অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ

চক্রধর। কি কল্যাণবাবু, খবর কি?

কল্যাণ। অত্যন্ত দুঃসংবাদ।

চক্রধর। কেন?

কল্যাণ। সুভদ্রা দেবী আমাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন— ভেবেছিলেন, আমি মহা ঐন্দ্রজালিক লোক। কিন্তু সব খুলে বলাতে এইমাত্র তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সদর্পে সবেগে প্রস্থান করেছেন।

চক্রধর [রাগিয়া উঠিয়া] তবে সে মেয়েটা কাকে বিয়ে করতে চায়?

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। কাউকে নয়।

চক্রধর। কাউকে নয়? তোমার ইচ্ছে নাকি?

সুভদ্রা। আমার ইচ্ছে ছাড়া আর কার ইচ্ছে বলুন?

চক্রধর। তবে তোমার ইচ্ছে নিয়েই তুমি থাক, তোমার বাপের সম্পত্তি যাক সেই সমিতির হাতে।

সুভদ্রা। সেই কথা শুনতেই এসেছি। বলুন, আমি বিয়ে না করলে টাকাকড়ি সব কি হবে।

চক্রধর। [রাগিয়া] তবে তাই হোক। এই শোন।

পকেট হইতে উইলপত্রখানা বাহির করিয়া

সর্ব্বানন্দবাবুর উইলের সর্ত্ত হচ্ছে—একুশ বছর পূর্ণ হ'লে বঙ্গীয় আইন-সভার কোন সদস্যকে তুমি বিবাহ না করলে যাবতীয় সম্পত্তি এবং টাকাকড়ি পাবে গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতি।

সুভদ্রা। সে সমিতি কোথায়?

চক্রধর। স্থাপন করতে হবে।

সুভদ্রা। তার উদ্দেশ্য কি?

চক্রধর। বাংলার, বিশেষভাবে প্রাচীন গৌড়নগরের, পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কার করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

সুভদ্রা। আর কি সর্ত্ত আছে?

চক্রধর। তোমাকে এর সেক্রেটারি মনোনয়ন তিনি ক'রে গিয়েছেন—টাকাকড়ি এবং সম্পত্তির ম্যানেজ্‌মেণ্ট তোমার হাতেই।

কল্যাণ। সর্ব্বানন্দবাবুর বিষয়বুদ্ধি একবারে ছিল না—একথা বলা যায় না। মেয়েকে এক হাতে বঞ্চিত ক'রে, আর এক হাতে দিয়ে গিয়েছেন।

সুভদ্রা। উইলের এমন সর্ত্ত জানলে আমি আদৌ বিয়ের চেষ্টা করতাম না।

চক্রধর। কেন?

সুভদ্রা। বিয়েতে সম্পত্তি ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল না। এতে দেখছি, সম্পত্তি আর স্বাধীনতা দুই-ই আছে।

চক্রধর। তোমার যেমন অভিরুচি।

সুভদ্রা। উকিলবাবু, আমার নিশ্চিত মত জেনে রাখুন, আমি বিয়ে করব না। উইলের নির্দ্দেশমত যাতে সমিতি স্থাপিত হয়, তার ব্যবস্থা করুন।

চক্রধর। তবে আমি সেই কথা জগদম্বা দেবীকে জানাইগে।

প্রস্থান

কল্যাণ। আমার একটি আবেদন আছে সুভদ্রা দেবী। সমিতি স্থাপিত হ'লে একজন ট্রেজারার প্রয়োজন হবে, আমি সেই পদের জন্য প্রথম উমেদার—এ কথা মনে রাখবেন।

সুভদ্রা। আপনাকে ট্রেজারারের পদ! হাত-সাফাইয়ের যে গুণ-কীর্ত্তন আপনি এই মাত্র করলেন।

কল্যাণ। সেই ভরসাতেই তো পদপ্রার্থী। তহাবলে যা কিছু ঘাটতি হবে তা হাত-সাফাই ক'রে ঢেকে দেব, কিছু বুঝতে দেব না।

সুভদ্রা। আচ্ছা, আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর।

প্রস্থান

ভৃত্যদের দ্বারা বাহিত হইয়া মণিময়বাবুর প্রবেশ; সঙ্গে দুই জন ডাক্তার; মণিময়বাবু আরাম-চেয়ারে পূর্ব্বের মত জড়বৎ পড়িয়া আছেন; সঙ্গে চক্রধরবাবু

কল্যাণ। ডাক্তারবাবু, রোগীর অবস্থা কি রকম?

পৃথীরাজ। দাঁড়ান, পরীক্ষা ক'রে দেখি।

উভয় ডাক্তারে মিলিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ততক্ষণে প্ল্যাষ্টার-অব-প্যারিস রোগীর পেটের মধ্যে গিয়া জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। তাহার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি সবশুদ্ধ জমিয়া প্রস্তরীভূত, রোগী মৃত

চন্দ্রগুপ্ত। পাল্‌স্‌ পাচ্ছি না কেন ?

পৃথ্বীরাজ। রেস্পিরেশন নেই কেন ?

চন্দ্রগুপ্ত। হার্ট স্টপ করছে নাকি ?

চক্রধর। [চীৎকার করিয়া] ইট ইজ এ কেস অব মার্ডার !

পৃথ্বীরাজ। নেভার মাইণ্ড। সায়েন্টিফিক মার্ডার।

চক্রধর। ও একই কথা।

পৃথ্বীরাজ। আজ্ঞে না। বৈজ্ঞানিক হত্যার নাম চিকিৎসা।

চক্রধর। আপনাদের পুলিসে দেব।

চন্দ্রগুপ্ত। [ধীরভাবে] তাতে কিছু ফল পাবেন না। আমাদের বিচারে সাক্ষ্য দেবার জন্যে ডাকা হবে বড় বড় ডাক্তারদের ; তারা সবাই বলবে, আমরা নির্দ্দোষ। জানেন তো, ইংরেজীতে বলে—ইউনিটি ইজ ষ্ট্রেংথ্‌ ?

কল্যাণ। কিন্তু রোগীর কি নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে ?

পৃথ্বীরাজ। নিশ্চিত ব'লে নিশ্চিত ? একেবারে ষোল আনা মৃত্যু।

চন্দ্রগুপ্ত। দু'জন ডাক্তারে মিলে একটা রোগীকে মারতে পারব না ? কি যে বলেন !

কল্যাণ। আহা, বেচারী ভদ্রলোক !

পৃথ্বীরাজ। ওঁর জন্যে দুঃখ করবেন না। ওঁর পেটের মধ্যে ওষুধ জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। উনি নিজেই নিজের স্ট্যাচু হয়ে উঠেছেন—এমনভাবে ম'রে অমর ক'জনে হ'তে পারে ?

কল্যাণ। এখন ওকে নিয়ে কি করা যায় ? দাহের বন্দোবস্ত করতে হয়।

পৃথ্বীরাজ। অমন কাজটি করবেন না। বরঞ্চ ওঁকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে কলেজ-স্কোয়ারে একটা স্তম্ভের ওপরে বসিয়ে রাখা যাক—এমন স্বয়ম্ভূ প্রস্তরমূর্ত্তি আর কোথায় পাবেন ?

কল্যাণ। কলেজ-স্কোয়ার পর্য্যন্তই যদি যেতে রাজি আছেন, তবে আর একটু এগিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দরজার পাশে বসিয়ে রাখলে তার চেয়ে ভাল হয়—ডাক্তারী-শাস্ত্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। আর নীচে লিখে দেওয়া যাবে—Abandon all hope, ye who enter here.

পৃথ্বীরাজ। হ্যাট্‌স্ ইট। এমন সুযোগ ছাড়া হবে না। ডাক্তারী-শাস্ত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, এই জীবন্ত স্ট্যাচু। নিন ডক্টর সেন, ঘাড়ে করুন।

চন্দ্রগুপ্ত। সার্টেন্‌লি।

দুই জনে তখন সেই ভূতপূর্ব্ব রোগীর মূর্ত্তীভূত দেহকে ঘাড়ে করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মূর্ত্তি পাথরের মূর্ত্তির মত জড় ও নিশ্চল ; চোখ দুইটি ঈষন্মুক্ত, মুখ অল্প ফাঁক

পৃথ্বীরাজ ও চন্দ্রগুপ্ত। আমাদের ফী।

কল্যাণ। এগোন, দিচ্ছি।

চক্রধর। এরা রাক্ষস, না ডাকাত, না বিদূষক—কি ?

কল্যাণ। এরা ডাক্তার। প্রকাশ্যে নিন্দা করবেন না, মানহানির দায়ে পড়বেন। এরা বৈজ্ঞানিক।

চক্রধর। তাই তো! আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে, আই অ্যাম্ সরি—ভেরি সরি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

১-দৃশ্য

গৌড় নগর; গোপালদেবের প্রাসাদ; দ্বিতলের প্রশস্ত বলভি, ভদ্রার প্রাসাদের অনুরূপ, মাঝখানে রাজাসন; তাহার পিছনে একখানি নাতিপ্রশস্ত পালঙ্ক, শয়নের জন্য নয়, রাজা অনেক সময় তাহাতে অর্দ্ধশায়িত ভাবে আরাম করেন, সেইজন্য একটি উপাধান ও সামান্য শয্যা আছে, আধুনিক কাল হইলে সেখানে একখানি আরাম-কেদারা থাকিত; রঙ্গমঞ্চে দুই দিক দিয়া প্রবেশ করা যায়, বাহিরের লোক সেই পথে প্রবেশ করে; পিছনে একটি দ্বার, গোপালদেব ও প্রাসাদের লোকের প্রবেশের জন্য, আধুনিক কাল হইলে তাহাতে 'প্রাইভেট' লেখা থাকিত; রাজার আসনের দুই পাশে দুই জন চামরধারিণী উপস্থিত, হাতে তাহাদের চামর; সিংহাসনের পিছনে একজন তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী, তাহার হাতের রূপার থালাতে প্রসাধনের দ্রব্য; অন্য কোন লোক নাই, কারণ গোপালদেব নিজের প্রাসাদে বন্দী; অন্য সময় হইলে সভাতে মন্ত্রী, অমাত্য অর্থী, প্রার্থীর অভাব হইত না; নীচের তলায় প্রাসাদের দ্বারের সম্মুখে মণিভদ্রের সৈন্যদল পাহারায় বসিয়াছে, কাহারও প্রবেশের বা বহির্গমনের উপায় নাই; কিন্তু উপরের তলায় একমাত্র নির্জ্জনতা ব্যতীত বন্দিত্বের কোন চিহ্ন নাই; গোপালদেব বুকে বাহুবদ্ধ অবস্থায় পায়চারি করিতেছে, মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতে চেষ্টা করিতেছে; মুখে একটা চিন্তার ভাব, ভয়ের নয়, উদ্বেগের নয়, এমন কি দুশ্চিন্তা বা মুক্তির উপায় সন্ধানেরও নয়; বিপদের সময়েই বোঝা যাইতেছে যে, গোপালদেব বীর-পুরুষ। প্রাসাদের দোতালার পাশে একটি শিমুলগাছ—একটা ডাল ঝুঁকিয়া আসিয়া দোতালার উপরে পড়িয়াছে; হঠাৎ একটা লোক, পোষাক ও চেহারায় ভৃত্য বলিয়া মনে হয়, সেই ডাল হইতে লাফাইয়া পড়িল; গোপালদেব চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

গোপালদেব। তুমি কে?

নকুড়। ইস, পায়ে বড্ড চোট লেগেছে।

গোপালদেব। কে তুমি ?

নকুড়। আজ্ঞে মহারাজ, আমি কোষাধ্যক্ষ জয়াপীড়ের ভৃত্য।

গোপালদেব। এই পথে এলে ?

নকুড়। কি করব মহারাজ, সব পথ যে বন্ধ! আমার কি ইচ্ছে এই পথে আসি! ইস, পায়ে বড্ড চোট লেগেছে।

গোপালদেব। তুমি গাছে উঠলে ওরা দেখতে পেলে না ?

নকুড়। আজ্ঞে, দেখতে পেয়েছিল, চিনতে পারে নি।

গোপালদেব। জয়াপীড়ের লোক ব'লে ?

নকুড়। আজ্ঞে না, বোধ হয় মানুষ ব'লেই চিনতে পারে নি।

গোপালদেব। সে কি রকম ?

নকুড়। আজ্ঞে, সবাই আমাকে মর্কট ব'লে ডাকত, তখন আমার বিশ্বাস হ'ত না। কিন্তু গাছে উঠতেও যখন ওরা বাধা দিলে না, তখন মনে হ'ল হয়তো ওদের কথাই ঠিক, আমার সঙ্গে কোথাও মর্কটের মিল আছে, সেই মনে ক'রেই ওরা বাধা দেয় নি।

গোপালদেব। জয়াপীড়ের সংবাদ কি ?

নকুড়। জয়াপীড়, কল্যাণবর্ম্মা, চক্রপাণি সবাই নিজের নিজের বাড়িতে বন্দী হয়েছেন। তার মধ্যে কোষাধ্যক্ষ জয়াপীড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মহারাজের সংবাদ না পেয়ে। আমি বললাম, কোন ভয় নেই কর্ত্তা, আমি মহারাজের সংবাদ নিয়ে আসব। চ'লে এলাম।

গোপালদেব। তুমি ফিরে গিয়ে জয়াপীড়কে চিন্তা করতে নিষেধ কর। তাকে ব'ল আজই আমরা মুক্ত হব।

নকুড়। আজই ?

গোপালদেব। হাঁ, আজই।

নকুড়। তবে আমি চললাম, মহারাজ।

গোপালদেব। হাঁ, যাও।

তখন সেই লোকটা ছাদের পাশে আসিয়া ডাল ধরিয়া উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল; গোপালদেব তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল; লোকটা অন্তর্হিত হইয়া গেলে, আবার পায়চারি করিতে লাগিল

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, একজন বিদেশী নর্ত্তকী এসেছে, সে মহারাজকে নৃত্য দেখাতে চায়।

গোপালদেব। নাচ দেখবার এমন অখণ্ড অবসর আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন থাক।

প্রতিহারী। সে কিছুতেই নিষেধ শুনছে না; তাকে অনেক চেষ্টা ক'রেও ফেরাতে পারি নি।

গোপালদেব। আচ্ছা, নিয়ে এস।

প্রতিহারীর প্রস্থান; নর্ত্তকী ও তাহার সঙ্গিনীর প্রবেশ; নর্ত্তকীর শাড়ি বিদেশী ধরণে পরা, গায়ে ওড়না; সেই ওড়না মাথার উপর দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; সঙ্গিনীর বেশও বিদেশী ধরণের, তবে তাহার মুখ আচ্ছন্ন নয়; তাহার হাতে একজোড়া মন্দিরা

তোমরা কি চাও?

সঙ্গিনী। মহারাজকে নাচ দেখাতে চাই।

গোপালদেব। আমার এখন সময় হবে না।

সঙ্গিনী। আমাদের সময় আরও অল্প, অনেক দূর থেকে মহারাজের নাম শুনে আসছি।

গোপালদেব। কোন্ দেশে তোমাদের বাড়ি?

সঙ্গিনী। কাশ্মীর।

গোপালদেব। কাশ্মীর! সে যে বহুদূর!

সঙ্গিনী। হাঁ, মহারাজ।

গোপালদেব। তোমার সঙ্গিনী কে ?

সঙ্গিনী। কাশ্মীরের বিখ্যাত নর্ত্তকী।

গোপালদেব। এর মুখ আবৃত কেন ?

সঙ্গিনী। আমাদের কাশ্মীরী নাচের এই হচ্ছে রীতি। মহারাজের অনুমতি হ'লে আরম্ভ করতে পারি।

গোপালদেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল

গোপালদেব। আচ্ছা, আরম্ভ কর।

এই বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিল

নর্ত্তকী নাচ আরম্ভ করিল; তাহার সঙ্গিনী নিম্নলিখিত গানটি মন্দিরা সংযোগে গাহিতে লাগিল; নর্ত্তকী সেই গানের তালে তালে নাচিতে লাগিল

গান

দরদি, দরদ দিয়ে অচেনায় নাও না দেখে !
আকাশের ওড়না ঠেলে কে দেখে নয়ন মেলে—
নীলিমার গভীরতায় হাহাকার শুনেছে কে ?
মেঘ সে কতখনের, বিজলী জ্বলেই মরে,
জাগে চাঁদ, সূর্য্য জাগে—ও অসীম নীলসায়রে ;
আজিকে বরষা নিবিড়, আকাশে মেঘের যে ভীড়,
বিজলি ঝিলিক মারে আঁধারে থেকে থেকে !

নাচ শেষ হইয়া গেল

গোপালদেব। চমৎকার ! কি পুরস্কার ইচ্ছা কর ?

তখন নর্ত্তকী মুখের ওড়না অপসারিত করিল। গোপালদেব দেখিল, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং ভদ্রা ; বিস্মিত গোপালদেব বলিল

ভদ্রা, তুমি !

ভদ্রা। বিস্মিত হ'লে ?

গোপালদেব। এই কদিনে এত বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি যে বিস্ময়ের আর কিছু নেই। কিন্তু এ ভাবে কেন ?

ভদ্রা। আমিও বন্দী হয়েছিলাম ; বের হবার উপায় ছিল না ; তোমার প্রাসাদে আমার ঢোকবার অনুমতি নেই, কাজেই ছলনা করতে হ'ল।

গোপালদেব। বেশ করেছ, কিন্তু তোমার ছুরি কই ?

ভদ্রা। ছুরি ! ছুরি কেন ?

গোপালদেব। তোমার আমার মধ্যে সেই সম্বন্ধই তো ছিল।

ভদ্রা। এবারে আর ছুরি নয়।

গোপালদেব। বল কি ? এবার আর বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

ভদ্রা। আমার পুরস্কার এখনও পাই নি।

গোপালদেব। প্রার্থনা কর।

ভদ্রা। গোপনে বলতে চাই।

গোপালদেব। [সকলের প্রতি ইঙ্গিতে] তোমরা এখন যেতে পার।

চামরধারিণীদ্বয়, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী ও নর্তকীর সঙ্গিনীর প্রস্থান

বল, কি প্রার্থনা ?

ভদ্রা। গোপালদেব, আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাই। মনে রেখ, গৌড়ের সমূহ বিপদ।

গোপালদেব। [ব্যঙ্গস্বরে] অনুগৃহীত হলাম। দেশকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার এমন মনোরম পন্থা আর মিলবে না, তা'ও জানি। কিন্তু একটু বাধা আছে।

ভদ্রা। কোন বাধা নেই।

গোপালদেব। তুমি জান না, আমার ঘরে গৃহিণী আছেন।

ভদ্রা। সে আমি সহ্য করতে পারব।

গোপালদেব। আমারও তো আবার সহ্য করতে পারা চাই।

ভদ্রা। দুই পত্নী হ'লে বিপদটা কোথায় ?

গোপালদেব। পুরুষ হ'লে বুঝতে। আচ্ছা ধর, তোমার যদি দুই স্বামী হ'ত ?

ভদ্রা। তা হ'লে তো বেঁচে যেতাম। দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজে নিষ্কৃতি পেতাম। দ্রৌপদীর মত সুখী কে ছিল ? তার ছিল পাঁচ স্বামী; স্বামিত্ব বজায় রাখবার জন্য একজনকে বনবাসে পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল।

গোপালদেব। ভদ্রা, এর চেয়ে তোমার ছুরি অনেক ভাল ছিল।

ভদ্রা। তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

গোপালদেব। বল, তারই দণ্ড দিতে এসেছ। ভদ্রা, তোমাকে আমি বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছিলাম।

ভদ্রা। সেই ভরসাতেই এসেছি।

গোপালদেব। কি সর্ব্বনাশ !

ভদ্রা। সর্ব্বনাশ বইকি ! ষড়যন্ত্রকারীরা গৌড়ের স্বাধীনতা বিপন্ন ক'রে তুলেছে, আর এ সময়ে তুমি ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে বসেছ ?

গোপালদেব। ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য ভাবি না, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতাম ; কিন্তু—

ভদ্রা। কিন্তু কি ? না, আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না গোপালদেব।

গোপালদেব ! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার মাথা বড্ড ঘুরছে।

এই বলিয়া গোপালদেব শয্যার উপরে গিয়া বসিল

ভদ্রা। না, এখন আর নারীসুলভ লজ্জার সময় নয়। গৌড়ের বিপদ,

আমার ধনরত্ন শক্তি-সামর্থ্য যা কিছু আছে নিয়ে তুমি গৌড়কে রক্ষা কর। জীবনে মরণে তুমি আমার।

গোপালদেব। কি সর্ব্বনাশ! শুধু জীবনে নয়, মরণেও?

ভদ্রা। গোপালদেব, তুমি হাসালে। গৌড়ের লোকের বিবাহ আর ব্যাধি গা-সহা হয়ে গেছে, এত ভয় কিসের?

গোপালদেব। ভয় কিসের? তুমি কি বুঝবে ভদ্রা? তুমি তো শুধু মৃত্যু জান জীবন্মৃত্যুর সংবাদ রাখ কি? মানুষ মরে একবার, জীবন্মৃত হয়ে থাকে অর্দ্ধেক জীবন। তার সুখ নেই, শান্তি নেই, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনের কোন বৈচিত্র্য নেই; জন্মের দিকচক্র থেকে মৃত্যুর দিগন্ত পর্য্যন্ত কেবল শীতমেরুর নির্জ্জীব শুভ্রতা। লোকে শুনেছে, পৃথিবীর ঘূর্ণন-বেগে যত স্বর্ণ সঞ্চিত হয়েছে উভয় মেরুর শীর্ষে, সেই লোভেই তারা ছোটে সেই দিকে। কিন্তু কেউ সোনা পেয়েছে আজ পর্য্যন্ত শুনি নি; হতভাগ্যদের শীর্ণ কঙ্কালে এই দুঃখের পথের পদাবলী রচিত। আমি হতভাগ্য, সেই শোকের রামায়ণের আর একটি শ্লোক। না না, আমি এই জীবনব্যাপী মৃত্যু চাই না, এক মুহূর্ত্তের মৃত্যু চাই।

ভদ্রা। জীবনব্যাপী মৃত্যু কাকে বলছ?

গোপালদেব। বিবাহ,—যে অতল সমুদ্রে পুরুষের পৌরুষের নদী গিয়ে পরিসমাপ্ত।

ভদ্রা। এই যদি তোমার অভিজ্ঞতা, তবে একবারই বা বিবাহ করলে কেন?

গোপালদেব। একবার করেছি ব'লেই তো আমার করতে ভয়।

ভদ্রা। গোপালদেব, যদি আমি পতিব্রতা হই, তবে তোমাকে বিয়ে করবই।

গোপালদেব। নাঃ, আর রক্ষা নেই। ভগবান, তুমি এবার রক্ষা কর।

সহসা গোপালদেব মৃতবৎ পালঙ্কের উপরে শুইয়া পড়িল ; ভদ্রা এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

ভদ্রা। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! কে আছ এখানে?

প্রতিহারীর প্রবেশ ; সে ভদ্রাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল

প্রতিহারী। কি হয়েছে? ভদ্রা দেবী, আপনি এখানে?

ভদ্রা। গোপালদেব অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র একজন বৈদ্য ডেকে আন।

প্রতিহারী। মহারাজের কি হ'ল?

ভদ্রা। তুমি আমি বুঝব কি ক'রে? যাও, শীঘ্র ধন্বন্তরিকে ডেকে আন।

প্রতিহারীর প্রস্থান

বাসুদেব, বাসুদেব, তোমাকে শত পল স্বর্ণ দেব, গোপালদেবকে বাঁচিয়ে তোল।

নিকটে গিয়া দেখিল

নাঃ, জীবনের কোন লক্ষণ নেই। এই রকম ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করতে হয় বাসুদেব?

ভদ্রা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল

ধন্বন্তরি ও তাহার দুই শিষ্যের প্রবেশ ; একজনের হাতে ঔষধের পুটুলি, অন্যের হাতে একখানা গ্রন্থ

ধন্বন্তরি। ব্যাধিটা কি?

ভদ্রা। তা নির্ণয় করবার জন্যই তো তোমাকে ডাকা।

ধন্বন্তরি। তা নির্ণয় ক'রে দিচ্ছি ; কিন্তু দ্বিগুণ পারিশ্রমিক চাই— একটা ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য, একটা ব্যাধি নিরাময়ের জন্য।

ভদ্রা। সে হবে। কিন্তু ব্যাধিটা কি?

ধন্বন্তরি। হুঁ, বড় কঠিন ব্যাধি।

ভদ্রা। নাম কি ?

ধন্বন্তরি। সংস্কৃত জানা আছে ?

ভদ্রা। কিছুমাত্র না, তুমি নির্ভয়ে ব'লে যাও।

ধন্বন্ত'রি। এই তো চাই, সবাই সংস্কৃত শিখলে পণ্ডিতরা বিপদে পড়ে। ব্যাধির নাম নৈযুজ্য পরাপত্তি ব্রহ্মবৈক্লব্যবাদ।

ভদ্রা। এর মানে কি ?

ধন্বন্তরি। তা হ'লে আবার সংস্কৃত বলতে হ'ল দেখছি।

ভদ্রা। সোজা কথায় বলতে পার না ?

ধন্বন্তরি। পারব না কেন ? তবে কি জান, জ্ঞান হচ্ছে কর্পূরের মত, যতক্ষণ তাকে সংস্কৃত ভাষায় দুরূহ পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়, বেশ থাকে, খুলে বের ক'রে আনলেই তা দেখতে দেখতে বায়ুতে মিলিয়ে যায়। এই যা ভয়। যাক, আমি সহজ-ভাবেই ব্যাখ্যা করছি।

একজন শিষ্যের প্রতি

ওহে বটু, গ্রন্থখানা খুলে যা বলছি মিলিয়ে নাও।

বটু গ্রন্থ খুলিয়া একটি শ্লোক বাহির করিল

এবার শোন। মানব-শরীরের আপাদমস্তক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন ; সেই স্নায়ুজাল সহসা আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে, উচ্চ সুরে বাঁধা বীণাতন্ত্রী যেমন কঠিন আঘাতে ছিন্ন হয়, তেমনই ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছে। মানব-দেহের বাম অঙ্গের স্নায়ুজাল সুষুম্নাকে অবলম্বন ক'রে দক্ষিণ মূর্দ্ধায় এবং দক্ষিণ অঙ্গের স্নায়ুজাল সুষুম্নাপথে বাম মূর্দ্ধায় মিলিত হয়েছে। বুঝলে ?

ভদ্রা। কোন ভয় নেই ধন্বন্তরি, এক বর্ণও বুঝি নি।

ধন্বন্তরি। তাতে ক্ষতি নেই, শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। কি বল বটু?

১ম বটু। আজ্ঞে, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

ভদ্রা। এবার রুগীকে সারাও।

ধন্বন্তরি। আগে ব্যাধি নির্ণয় ক'রে নিই।

ভদ্রা। ততক্ষণে রুগী মারা যাক আর কি!

ধন্বন্তরি। তা গেলে কি করব? তাই ব'লে ব্যস্ততা ক'রে তো রোগ অমীমাংসিত রাখতে পারি না।

ভদ্রা। আগে রুগী সারাও, পরে রোগ চিন।

ধন্বন্তরি। সেটা কেমন ক'রে সম্ভব? রুগী বেঁচে গেলে তো রোগ অন্তর্হিত হবে।

ভদ্রা। তবে কি রুগীকে মেরে ফেলে রোগ চিনবে নাকি?

ধন্বন্তরি। অনেক সময় তার প্রয়োজন হয় বইকি। আর তাতে মস্ত একটা সুবিধা এই যে, বেশ র'য়ে ব'সে ধীরে সুস্থে গবেষণা করা যায়, মৃতের তো ব্যস্ততা নেই।

ভদ্রা। কি সর্ব্বনাশ!

ধন্বন্তরি। একটি রুগীর মৃত্যু দিয়ে আমরা কত রুগীর জীবনের পথে প্রবেশ করি! চিকিৎসাশাস্ত্র কি সহজ শাস্ত্র! একে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

ভদ্রা। রুগীর মৃত্যুতে তোমাদের দুঃখ হয় না?

ধন্বন্তরি। যতক্ষণ রুগীর অভিভাবক বেঁচে আছে, দুঃখ কিসের?

ভদ্রা। কেন?

ধন্বন্তরি। পারিশ্রমিক তো সেই দেবে।

ভদ্রা। আচ্ছা, এখন রুগীকে দেখ।

ধন্বন্তরি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল

ধন্বন্তরি। হুঁ। এর বাম মূর্দ্ধায় আঘাত লেগেছে। যদি এর দক্ষিণ মূর্দ্ধায় আঘাত লাগত, বাঁচাতে পারতাম; বাম মূর্দ্ধার আঘাত স্বয়ং শিবের অসাধ্য।

ভদ্রা। তা হ'লে বাঁচাতে পারবে না বলছ?

ধন্বন্তরি। আমি কিছুই বলছি না। আমার বিজ্ঞানে যা বলে তাই বলছি। আমার পারিশ্রমিক?

ভদ্রা। পারিশ্রমিক! না পারলে রুগী বাঁচাতে, না পারলে রোগ চিনতে।

ধন্বন্তরি। রোগ একশো বার চিনেছি, কিন্তু রোগ চিনতে চিনতে রুগী মারা গেলে কি করব? রুগী এ রকম অবিবেচক হ'লে চলে না।

গোপালদেবের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নাগভট, ইন্দ্রদত্ত, ঈশ্বরঘোষ ও মণিভদ্রের প্রবেশ

মণিভদ্র। [বিস্মিতভাবে] ভদ্রা, তুমি!

নাগভট্ট। মৃত্যু? কি ক'রে হ'ল?

ইন্দ্রদত্ত। নিশ্চিত মারা গেছে?

ধন্বন্তরি। সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু আমার পারিশ্রমিকটা?

ভদ্রা। তুমি বাইরে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, আমি দেব।

ধন্বন্তরি ও শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান

ঈশ্বরঘোষ। ভগবান যে আছেন, তার অন্তত একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

ভদ্রা। কেমন ক'রে?

ঈশ্বরঘোষ। যে সময় আমরা গোপালদেবকে নিয়ে কি করা যায় ভাবছিলাম, ভগবান ভাল ছেলেটির মত তাকে সরিয়ে নিলেন।

ভদ্রা। তোমাদের ভগবান তোমাদের মতই কঠিন।

মণিভদ্র। সে কথা মিথ্যা নয় ভদ্রা। পাথর দিয়েই লোকে দেবমূর্ত্তি রচনা করে।

ইন্দ্রদত্ত। এখন তা হ'লে—

নাগভট্ট। নূতন রাজা নির্ব্বাচন করা যাক।

ঈশ্বরঘোষ। "রাজা মরেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হোক!"—এই ব'লে চল আর একবার নূতন রাজা নির্ব্বাচন করি।

নাগভট্ট। গোপালদেবের আর যে দোষই থাকুক, লোকটা সময়মত মরতে জানে।

ঈশ্বরঘোষ। এ বড় কম গুণ নয়। গোপালদেব না মরলে কি বিপদই না হ'ত! নীল পদাতিক-সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল—

মণিভদ্র। দেখ, নূতন রাজা নির্ব্বাচনের আগে এক কাজ বাকি আছে। নীল পদাতিক-বাহিনীকে এখানে নিয়ে এস।

নাগভট্ট। এখানে?

মণিভদ্র। ভয় কিসের? তারা এসে দেখে যাক, গোপালদেব মৃত। তো আর তাদের বিদ্রোহের কোন কারণ নেই। সেই সঙ্গে জয়াপীড়, চক্রপাণি আর কল্যাণবর্ম্মাকেও ডেকে এনে দেখিয়ে দিতে হবে গোপালদেবের মৃতদেহ।

নাগভট্ট। ইন্দ্রদত্ত, তুমি যাও তা হ'লে।

মণিভদ্র। জয়াপীড়দের ভেতরে নিয়ে এস। আর নীল পদাতিক-বাহিনীর সৈন্যরা প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াক, মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাবার সময়ে দেখতে পাবে।

নাগভট্ট। কিংবা কল্যাণবর্ম্মাকে দিয়ে সংবাদটা তাদের দিলেই বিশ্বাস করবে।

ইন্দ্রদত্ত। আমি চললাম তবে।

প্রস্থান

নাগভট্ট। নির্ব্বাচনটা এখানেই হয়ে যাক।

ঈশ্বরঘোষ। এবারে সাবধানে করতে হবে; যে রাজা প্রজাদের আয়ত্তের অতীত, সে অত্যাচারী।

নাগভট্ট। রাজা তো ঠিক হয়েই আছে। কি বল মণিভদ্র, তোমার আপত্তি নেই তো?

মণিভদ্র। একটু আছে বইকি। গৌড়ের নিয়ম তোমরা আমার চেয়ে ভাল জান, অবিবাহিত লোক নির্ব্বাচিত হবার অধিকারী নয়।

নাগভট্ট। রাজ্ঞীও তো ঠিক হয়েই আছে। ভদ্রা দেবী, তুমি দয়া ক'রে মণিভদ্রকে বিবাহ করলে আমরা তাকে রাজা ব'লে নির্ব্বাচন করতে পারি।

ভদ্রা। তোমরা কাপুরুষ। একজন অসহায়া নারীকে—

মণিভদ্র। অসহায়া নারী! কে বললে তুমি অসহায়? আমার যতদূর বিশ্বাস, তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই গোপালদেব অকালে দেহত্যাগ করেছে।

ভদ্রা। মিথ্যা কথা।

মণিভদ্র। তুমি বলতে চাও, গোপালদেব দেহত্যাগ করে নি? আমি ধন্বন্তরিকে আনিয়ে শপথ করাচ্ছি।

ভদ্রা। চিকিৎসকে সবই করতে পারে। জীবন্তকে তারা মেরে ফেলতে পারে।

মণিভদ্র। তাই ব'লে মৃত্যুকে জীবন দিতে পারে না।

ভদ্রা। ভগবান! যদি পারত!

মণিভদ্র। সেটা যখন অসম্ভব, তখন না হয় গতস্য শোচনা না-ই করলে।

ভদ্রা! তোমরা কি ভাব, নারী পুরুষের খেলার সামগ্রী?

মণিভদ্র। এমন দুঃসাহস আমাদের নেই। আমরা ভাবি, পুরুষই নারীর খেলার সামগ্রী। তোমার একটা খেলনা ভেঙেছে, তার বদলে আর একটা গ্রহণ কর।

ভদ্রা। তুমি নির্দ্দয়।

মণিভদ্র। ভদ্রা দেবী, অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে, নির্দ্দয়তা প্রেমের সবচেয়ে বড় উপাদান।

ভদ্রা। তোমাকে আর কি বলব!

মণিভদ্র। কিছু বলতে হবে না। তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি।

ভদ্রা। পার নি। আমি তোমাকে ভালবাসি না।

মণিভদ্র। শুনে আশ্বস্ত হলাম। বিবাহ আর প্রেম দুটো সহ্য করবার শক্তি আমার নেই। চিনির ভারবাহী গর্দ্দভ চিনির স্বাদ পায় না, ওটা অপরের জন্য; ভারটা যেন বিবাহ, চিনিটা প্রেম। উপমাটা আমার পক্ষে অবশ্য গৌরবজনক হ'ল না, কিন্তু কি করব বল, অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার অধিকার অতি সামান্য।

নাগভট্ট। ভদ্রা দেবী, তুমি চন্দ্রসেনের কন্যা, গৌড়ের তুমি শ্রেষ্ঠ ধনিকা; দেশের জন্য কত লোকে প্রাণ দিয়েছে, আর তুমি একটা বিবাহ করতে পারবে না?

ভদ্রা। অপ্রীতিকর বিবাহ?

নাগভট্ট। ভদ্রে, বিবাহ মাত্রই অপ্রীতিকর। তোমার সৌভাগ্য এই যে, তুমি তা আগেই জেনে ফেলেছ; পরে আর অপ্রত্যাশিতভাবে হতাশ হতে হবে না।

ঈশ্বরঘোষ। বৎসে, আমাদের অনুনয় রাখ, মণিভদ্রকে বিবাহ কর; মণিভদ্র রাজা হয়ে গৌড়কে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করুক।

নাগভট্ট। আর এর যদি নেহাৎ আপত্তি থাকে, তবে উদ্দণ্ডপুরের চন্দ্রা দেবীকে বিবাহ কর মণিভদ্র, শুনেছি সে তোমার প্রতি অনুরক্ত।

ভদ্রা। চন্দ্রা কে?

মণিভদ্র। একটি মহিলা মাত্র।

ভদ্রা। তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'ল কোথায়?

মণিভদ্র। সে এক কাব্য। সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা, শালের বনে ফুল ফুটেছে, বাতাসে তার মদিরা, বনের যত কোকিল মুকুল খেয়ে গলা ভেঙে ফেলেছে, আমি চলেছি সেই বনপথে—একা; না, ঠিক একা নয়, সঙ্গে ছিল—

ভদ্রা। সেই চন্দ্রা?

মণিভদ্র। চন্দ্রা নয়। ছিল আমার অশ্ব আর আমার একমাত্র প্রিয়—

ভদ্রা। বুঝেছি বুঝেছি, সেই হতভাগা মেয়েটা।

মণিভদ্র। না, আমার প্রিয় তলোয়ারখানা। এমন সময়ে—

ভদ্রা। এমন সময়ে এল সেই নির্লজ্জ মেয়েটা।

মণিভদ্র। এলে ভালই হ'ত। কিন্তু তার বদলে এল চঞ্চলনেত্রা তন্বী—

ভদ্রা। থাক থাক, আর বলতে হবে না; সেই মেয়েটা তো?

মণিভদ্র। না, একটি হরিণী।

ভদ্রা। যাক, বাঁচা গেল।

মণিভদ্র। বাঁচা গেল কোথায়! সেই তো হ'ল আমার কাল। সেই হরিণীর কণ্ঠে ছিল সোনার একটি পদক, তাতে লেখা ছিল, "যে

আমার এই হরিণ খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে করব আমি বিবাহ—ইতি চন্দ্রা।" একেবারে রীতিমত মৃগীমেধ যজ্ঞ। তখন হরিণটাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে—

ভদ্রা। থাক থাক, আর বলতে হবে না, চুপ কর।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া

আমি নিজের জন্য নয়, প্রেমের জন্য নয়, গৌড়ের সুখ এবং শান্তির জন্য, তোমাকে পতিত্বে বরণ করলাম।

এই বলিয়া সে নিজের কণ্ঠহার খুলিয়া মণিভদ্রের গলায় পরাইয়া দিল।

নাগভট্ট। ভদ্রা দেবী, দেশের জন্য এই যে তুমি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করলে, দুঃসহ দুঃখ বরণ ক'রে নিলে, সেজন্য তোমাকে গৌড়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঈশ্বরঘোষ। ভদ্রা দেবী, সত্য বলছি, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি গৌড়ের জন্য ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করেছ।

মণিভদ্র। কিন্তু আমি সেই হরিণের কাহিনীটা শেষ না ক'রে পারছি না। তখন আমি হরিণটাকে ধ'রে নিয়ে—

ভদ্রা। ও কাহিনী থাক, আমি শুনতে চাই না।

মণিভদ্র। শুনলে ক্ষতি কি? সে এক রোমাঞ্চকর কাব্য।

ভদ্রা। আমি বুঝেছি, তুমি হ'রণটা ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাকে দিলে।

মণিভদ্র। একটু ভুল হ'ল। অনেক দিন থেকে একটা সাধ ছিল, তাই পূর্ণ করলাম। হরিণের মাংস কখনও খাই নি, সেটাকে কেটে রেঁধে খেলাম; আর সেই সোনার পদকটা খুলে নিয়ে একটি অঙ্গুরী গড়িয়ে, তার ওপরে নিজের নাম লিখে—

ভদ্রা। থাম থাম, আর আমি শুনতে চাই না।

মণিভদ্র। আর আমার বলবারও নেই। এই আমি সেই অঙ্গুরীয়ক তোমার হাতে পরিয়ে দিলাম।

এই বলিয়া সে অঙ্গুরী বাহির করিয়া ভদ্রার আঙুলে পরাইয়া দিল; এমন সময় প্রাসাদের বাহিরে সমবেত সৈন্যদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"মহারাজ গোপালদেবকি জয়!"

নাগভট্ট। ওই যে নীল পদাতিক বাহিনী এসেছে! ওদের তাড়াতাড়ি মৃত্যু-সংবাদটা দিতে হয়, নইলে হয়তো প্রাসাদ আক্রমণ ক'রে বসবে।

জয়াপীড়, কল্যাণবর্ম্মা ও চক্রপাণির দ্রুত প্রবেশ

জয়াপীড়। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজের মৃত্যু হয়েছে? এ মাসের বেতনটা আমাদের দেবে কে?

কল্যাণবর্ম্মা। আঃ, থাম জয়াপীড়। নাগভট্ট, কেমন ক'রে এ ঘটল?

ভদ্রা। কল্যাণবর্ম্মা, ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক। আমি ধন্বন্তরিকে আনিয়ে কত চেষ্টা করলাম, কিছু হ'ল না।

চক্রপাণি। সৈন্যেরা মনে করেছে, এ তোমাদের কাজ।

মণিভদ্র। আমরা যুদ্ধে মারতে জানি, বিষপ্রয়োগ বা গুপ্তহত্যায় আমরা সিদ্ধহস্ত নই।

জয়াপীড়। কি সর্ব্বনাশ!

চক্রপাণি। এখন কর্ত্তব্য কি?

মণিভদ্র। সেইজন্যই তো তোমাদের আসতে বলেছি। তোমরা নিজেরা স্বচক্ষে দেখে একবার সৈন্যদের বল।

নাগভট্ট। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে লাভ কি?

ঈশ্বরঘোষ। শীঘ্র আর একজন রাজা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। গৌড় রাজহীন হয়েছে সংবাদ পেলেই শত্রুরা আবার আক্রমণ করতে অগ্রসর হবে।

নাগভট্ট। কল্যাণবর্ম্মা, নীল পদাতিক-বাহিনী প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে, তুমি তাদের একটু শান্ত ক'রে এস।

কল্যাণবর্ম্মা। কিন্তু তার আগে একবার বল—"রাজা মৃত; রাজা দীর্ঘজীবী হোক।"

সকলে। [মৃদুস্বরে] রাজা মৃত; [উচ্চস্বরে] রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

উচ্চস্বরে প্রাসাদের বাহিরে ধ্বনিত হইল—"রাজা দীর্ঘজীবী হোক।"

গোপালদেব তড়াক করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল

গোপালদেব। তোমাদের সমবেত অনুরোধ অস্বীকার করতে পারলাম না।

সকলে ভীত, স্তম্ভিত, বিস্মিত। মণিভদ্র ও ভদ্রা ব্যতীত সকলেরই মুখ দিয়া একটি মাত্র অর্দ্ধস্ফুট শব্দ বাহির হইল, একটি সুদীর্ঘ 'অ্যাঁ'

ভদ্রা। গোপালদেব, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

গোপালদেব। কেন, মরতে পারি নি ব'লে?

মণিভদ্র। গোপালদেব, তুমি পরম বিশ্বাসী।

গোপালদেব। কেন, মৃত্যুর ভান করেছিলাম ব'লে?

নাগভট্ট। আমাদের বন্দী এবার আমাদের বন্দী করেছে।

চক্রপাণি। মহারাজ, অনুমতি হ'লে এবার ষড়যন্ত্রকারীদের বন্দী করি।

গোপালদেব। তার চেয়ে তাদের চিনে রাখ।

জয়াপীড়। মহারাজের ক্ষমা-গুণের ঝোঁক সামলাতেই আমাদের প্রাণান্ত। ক্ষমা-গুণ হবে খিড়কি দরজার মত, ফাঁক সামান্য, যাতে অল্প লোক বেরিয়ে যেতে পারে; কিন্তু মহারাজের ক্ষমা-গুণ যেন সিংহদ্বার, কেউ আর বাদ পড়ে না।

গোপালদেব। কারাগারের আয়তন বাড়াতে গেলে দেখবে, তার সীমা কোথাও টানা যায় না। কারাগার এত ব্যয়বহুল যে তাকে

রাজাদের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অবাধ ক্ষমার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু খরচও কম, লোকও সন্তুষ্ট থাকে।

ধন্বন্তরি ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ; রাজাকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে ধন্বন্তরি বলিল

ধন্বন্তরি। একি, রুগী বাঁচল কি ক'রে! আমার শাস্ত্র বলছে, এ রোগে বাঁচা অসম্ভব।

জয়াপীড়। তবে তোমার শাস্ত্র ভুল।

ধন্বন্তরি। আমার শাস্ত্র ভুল! শাস্ত্রকে লঙ্ঘন ক'রে ওর বাঁচাই ভুল। এ রকম ক'রে সবাই যদি শাস্ত্র লঙ্ঘন করতে থাকে, তবে শাস্ত্রের ওপর লোকের শ্রদ্ধা থাকে কি ক'রে? আমি এর বিচার চাই।

জয়াপীড়। তার চেয়ে তোমার শাস্ত্র বদলে ফেল।

ধন্বন্তরি। শাস্ত্র বদলাব! কখনও না। বরঞ্চ আজ থেকে টীকা, টিপ্পনি, গ্রন্থ, ভাষ্য লিখে প্রমাণ করব যে, শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন ক'রে ওর বাঁচাই অন্যায় হয়েছে, ঘোরতর অশাস্ত্রীয় অন্যায়। একদিন ছিল যখন শাস্ত্রের বিধানের সত্যতা প্রমাণের জন্য এদেশের লোকে প্রাণ দিতে পারত। আর আজ? হায়! হায়!

গোপালদেব। ধন্বন্তরি, বৃথা তুমি দুঃখ করছ। আমি তো মরি নি, দম বন্ধ ক'রে পড়েছিলাম মাত্র।

ধন্বন্তরি। [উল্লাসের সহিত] জয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের। জয় চরক-সুশ্রুতের। তাই বলি, শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয়! ভদ্রা দেবী, আমি যে এঁকে বাঁচাতে পারি নি, তার একমাত্র কারণ এ মরে নি। একবার সত্য সত্য মরুক, আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। মহারাজ, আমার অনুরোধ, একবার শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণের জন্য মৃত্যু বরণ কর।

গোপালদেব। তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না ধন্বন্তরি, সেজন্য আমি দুঃখিত।

ধন্বন্তরি। মহারাজ, আমার পারিশ্রমিক ?

গোপালদেব। যাও, আমি যাচ্ছি।

ধন্বন্তরি ও শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান

কল্যাণবর্ম্মা। মহারাজকে দেখবার জন্য প্রজারা আর নীল পদাতিক-বাহিনী অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে ; একবার তাদের দেখা দিয়ে কিছু বলতে হবে।

গোপালদেব। চল।

গোপাল দেব অগ্রসর হইয়া বলভির একেবারে ধারে গিয়া দাঁড়াইল, অর্থাৎ পাদপ্রদীপের ধারে

মণিভদ্র। ভদ্রা!

ভদ্রা। [ঝাঁঝালো স্বরে] চুপ কর, আমার সঙ্গে কথা ব'ল না।

মণিভদ্র। এই তো, এরই মধ্যে তোমার কথায় পতিব্রতা স্ত্রীর সুর লেগেছে।

ভদ্রা। থাম বলছি।

নীচের জনতার দিকে চাহিয়া গোপালদেব বলিল

গোপালদেব। গৌড়বাসী, তোমরা মূর্খ এবং নির্ব্বোধ।

নীচের জনতা। [আনন্দে] জয়, মহারাজের জয়।

গোপালদেব। তোমরা ভণ্ড এবং কাপুরুষ।

নীচে আনন্দধ্বনি উঠিল

তোমরা মিথ্যাবাদী এবং শঠ।

পুনরায় নীচে আনন্দধ্বনি উঠিল

তোমরা নিজেদের ভাল মন্দ বোঝ না, কারণ তোমাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই,—উড়ো কথা, বইয়ে-পড়া ভাব, আর তোমাদের চেয়ে শঠতর ব্যক্তি তোমাদের চালনা করে। শৃঙ্খলার

নামে তারা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় শৃঙ্খল, তারই ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গান ক'রে তোমরা ভাব, স্বাধীনতা পেয়েছ। আজকের দিনে বাহ্য স্বাধীনতা নিরর্থক, যদি না তার সঙ্গে থাকে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা। গৌড়ের ধনীরা, শ্রেষ্ঠীরা, ভূস্বামীরা দেশের স্বাধীনতা চায় তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য, জনসাধারণের উন্নতির জন্য নয়। তারা তোমাদের পেষণ করছে, দলন করছে, ছলনা করছে, তোমাদের দিয়ে তাদের স্বার্থের রথ টানাবার জন্য।

আমি এসে গৌড়কে বাহ্য শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেছি, এইবার সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে। আভ্যন্তরীণ এই অসংখ্য বালখিল্য ছদ্মবেশী শত্রুকে আমায় জয় করতে হবে। অরাজকতার মত বহুরাজকতাও কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

তোমাদের আমি পদে পদে ব্যাহত করব, হাতে ধ'রে অতি তুচ্ছ কর্ত্তব্যও শিক্ষা দেব, তবেই হয়তো একদিন বুঝতে পারবে, তোমরা বয়স্ক নাবালক, তোমাদের শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই ; স্বার্থ বোঝবার ক্ষমতা চাই, সৈন্যশ্রেণীর নিয়মতন্ত্রতা চাই। বড় কিছু পেতে হ'লে বড় রকম ত্যাগ চাই। যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাও, তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আজ সমষ্টির স্বাধীনতার পক্ষে বাধা, তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর। নতুবা শুধু বাহ্য স্বাধীনতায় তোমাদের বাঁচানো যাবে না। বহু স্বাধীন জাতি এই রোগে মারা গিয়েছে, তোমরাও যাবে। কারও সাধ্য নেই, আত্ম-প্রতারককে উদ্ধার করে।

নীচে সুদীর্ঘ আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল

নাগভট্ট। মহারাজের সাহস আছে বটে।

ঈশ্বরঘোষ। এমন নিষ্ঠুর সত্য লোকে যে কি ক'রে সহ্য করলে, তাই ভাবছি।

জয়াপীড়। কিছু বোঝ নি তোমরা; কথাগুলো এমন উগ্রভাবে সত্য যে, লোকে এটাকে রাজকীয় পরিহাস ব'লে গ্রহণ করেছে, তাই এত উল্লাস।

মণিভদ্র। স্পষ্ট সত্য কথার চেয়ে সূক্ষ্ম পরিহাস আর কি আছে!

এমন সময়ে বল্লভা একখানা ওড়না হাতে দ্রুত প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় সে গোপালদেবকে দেখিতে পায় নাই। ভদ্রার কাশ্মীরী বেশ দেখিয়া বল্লভা অবাক হইয়া গেল

বল্লভা। ওমা, এ আবার কি ছিরি! তাই বলি, ছদ্ম-পোষাকে বেরিয়ে আসা হয়েছে! আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে মরছি! নাও নাও, এই চাদরখানা গায়ে দাও; মেয়েটা ঠাণ্ডা লেগেই মরবে।

মণিভদ্র। বল্লভা, কিছু নূতন দেখছ?

বল্লভা মণিভদ্রের গলায় মালা ও ভদ্রার আঙুলে অঙ্গুরীয় লক্ষ্য করিয়া কহিল

বল্লভা। ওমা! তাই নাকি? বলি ভদ্রা, সত্যি নাকি?

ভদ্রা। চুপ কর বল্লভা।

বল্লভা। কেন চুপ করব? একশোবার বলব। তুমি বিয়ে করবে আর আমি একটু আহ্লাদ করতে পারব না?

ভদ্রা আহ্লাদ পরে ক'র।

বল্লভা। পরে কেন? এখনই করব। যাক, এবার আমি স্বস্তিতে মরতে পারব।

এমন সময়ে সে গোপালদেবকে দেখিতে পাইল

এই যে, মহারাজ যে। লোকে বলছিল মহারাজের মৃত্যু হয়েছে;

আমি বলি, কথখনও না। আমি দূর থেকে মহারাজের গলার স্বর শুনতে পেয়েছি।

গোপালদেব। ইচ্ছে ক'রেই উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, যাতে দূর থেকে শোনা যায়—হাজার বছরের দূরত্ব থেকে।

বল্লভা। [কথার গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া] তা যাবে বইকি, খুব শোনা যাবে।

ভদ্রা। ততদিন যদি গৌড় থাকে।

জয়াপীড়। ততদিন যদি গৌড়ে মানুষ থাকে।

বল্লভা। মানুষ থাকবে না কেন? [দর্শকদের দিকে চাহিয়া] এরা তবে কি?

জ-দৃশ্য

গৌড় নগরের প্রান্ত; একটি খোলা মাঠ; ইতস্তত পালবংশের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ; মাঝখানে একটি স্তম্ভ—গোপালদেবের কীর্ত্তি বলিয়া লোকে জানে; ইহার পিছনে একটি বড় নিমগাছ, ডাল-পালা এত বেশী যে, একজন লোক লুকাইয়া থাকিলে নীচে হইতে দেখা যায় না।

শীতের ভোরবেলা; অতি সূক্ষ্ম কুয়াশার একখানা মলমল যেন কে ঝুলাইয়া দিয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া মানুষকে খানিক পরিমাণে ছায়াশরীরী বলিয়া মনে হয়।

এই স্তম্ভের কাছে, এই ভোরবেলা কলিকাতার গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতির নেতৃত্বে সভা আহূত হইয়াছে; এ সমিতির উল্লেখ আমরা আগে করিয়াছি; এর সেক্রেটারি সুভদ্রা দেবী, ট্রেজারার কল্যাণ; এঁরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি।

গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতি হঠাৎ গোপালদেবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্মৃতি-সভার আয়োজন করিয়াছেন; কলিকাতা হইতে বিশিষ্ট সব ব্যক্তি, বড় বড় ঐতিহাসিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, দেশনেতা আসিয়াছে, কাউন্সিলের অনেক সভ্যও আসিয়াছে, বাংলা দেশের দুর্দ্দশার দিনে গোপালদেবের রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব হইতে সকলেই অনুপ্রেরণা শোষণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া দেশের কাজে লাগিয়া যাইবে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতির প্রোপাগাণ্ডার ফলে গোপালদেব নূতনতম ফ্যাশনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এমনকি এই উপলক্ষে কলিকাতায় আগত অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত সাঁতারু এসটার হেট্‌স ও অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড় ব্রাড্‌মানের কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। ইংরেজী বাংলা দৈনিক কাগজের রিপোর্টার এক ঝাঁক আসিয়াছে; 'কেলি-কদম সিনেমা কোম্পানী' ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে; নিখিল-ভারতীয় রেডিও প্রতিষ্ঠান বেতারে সভার সংবাদ পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছে, গোপালদেবকেই এই দুর্দ্দিনে

বাঙালী একমাত্র ত্রাণকর্তা মনে করিয়া, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আসিয়াছে; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থা ছাড়া নাকি বাঙালীর আর উদ্ধার নাই।

সাতটায় সভা আরম্ভ হইবার কথা; কিন্তু সভা আরম্ভ হইল না বলিয়া সাতটা বাজিল না, বোধ হয় সভা আরম্ভ হইলে সাতটা বাজিবে। সভাপতি আসিয়া পৌঁছায় নাই; অন্যান্য বক্তারা আসিয়াছে, প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করিয়া রিপোর্টার; কারণ এমন সব মূল্যবান বক্তৃতা গোড়ের মাঠে মারা যাইবে, তাহা কে ইচ্ছা করে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, সে এমন কথা আজ বলিবে, "গৌড়জন যাতে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মনে মনে, রঙ্গমঞ্চকে দুইটি ভাগ কর; পশ্চাদ্ভাগে স্তম্ভ, নিমগাছ ও সভার আয়োজন; পুরোভাগ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা; সভা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই জন বা তিন জন করিয়া লোক এখানে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে; তাহারা কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে যাইবে, আবার দুই তিন জনের ছোট একটি দল আগাইয়া আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে; সভা আরম্ভ হইলে রঙ্গমঞ্চকে অখণ্ড একটি স্থান বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে।

বামভাগে কল্যাণ ও সুভদ্রার প্রবেশ

কল্যাণ। ওই বোধ হয় এলেন। মোটরের শব্দ।

সুভদ্রা। প্রেসিডেণ্ট? না, তিনি তো আসবেন এরোপ্লেনে।

কল্যাণ। তবে উনি কে? লোকজন সব ছুটেছে, একবার যাওয়া যাক।

উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

ঝুনঝুনওয়ালা ও মোতিবাবুর প্রবেশ; ঝুনঝুনওয়ালা মাড়োয়ারী, এর প্রকাণ্ড ঘৃতের ব্যবসায়; আর মোতিবাবুর পাথরগুঁড়ার কারখানা; আটা ও ময়দার সঙ্গে ভেজাল দিবার জন্য পাথরের গুঁড়ার খুব কাটতি

মোতিবাবু। রাম রাম শেঠজি, আপনি কোথা থেকে?

ঝুনঝুনওয়ালা। রাম রাম মোতিবাবু। হামি নেপালসে আসছি।

মোতিবাবু। নেপালে? পশুপতিনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন বুঝি?

ঝুনঝুনওয়ালা। হাঁ, সোভি বোলতে পারেন। লেকিন একঠো ব্যবসা হ্যায়।

মোতিবাবু। নেপালে আবার কিসের ব্যবসা?

ঝুনঝুনওয়ালা। বহুৎ বড় বড় সাঁপ মিলতা। অজগর সাঁপ।

মোতিবাবু। সাপ! চিড়িয়াখানায় কি আপনি সাপ সাপ্লাই করেন নাকি?

ঝুনঝুনওয়ালা। উসমে আর কত্তে মুনাফা হোবে?

মোতিবাবু। তবে?

ঝুনঝুনওয়ালা। সাঁপের চর্ব্বি বিউমে ডাল করকে—হাঃ হাঃ, আউর সব তো বুঝেন, আপকো ভি পাথরকা গুঁড়াকা ব্যবসা হ্যায়।

মোতিবাবু। তা এখানে কেন?

ঝুনঝুনওয়ালা। শুনলাম যে, ইঁয়া একঠো তামাসা হোগা, বহুৎ বড়া বড়া আদমি আসবে, খরচা তো কুছ নেই, চলা গিয়া। আপনি কেন মোতিবাবু?

মোতিবাবু। শালা বাঙালীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। আটা আর ময়দায় মেশাবার জন্যে যে পাথরগুঁড়োর কারখানা আছে, তার বিরুদ্ধে বড় আন্দোলন চলছে। মুর্খেরা বোঝে না, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে শুধু আটা খেয়ে আর সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলবে না। ওর সঙ্গে কিছু কিছু পাথরের গুঁড়ো খেলে শরীর শক্ত হবে। হৃদয়কে পাষাণ ক'রে তোলবার এই একমাত্র পন্থা। আর হৃদয় শক্ত না হ'লে এ কলকব্জার যুগে টিকবে কেমন ক'রে?

ঝুনঝুনওয়ালা। বঙ্গালী বড়া সৌভাগ্যবান। আপনার মত আদমি যুগমে একঠো হোতা হ্যায়। লেকিন এখানে কেন?

মোতিবাবু। বক্তৃতা দেব। ভেজাল দেবার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব: গোপালদেবকে আহ্বান ক'রে বলব, এস তুমি আবার। ভেজাল দেবার রীতি বন্ধ কর। ভেজাল জিনিস খেয়েই বাঙালী গেল। তবে তো লোকে বিশ্বাস করবে, আমি কখনও ভেজাল দিই না।

ঝুনঝুনওয়ালা। বাঃ বাঃ, মোতিবাবু! বঙালী বহুৎ সায়ান্টিফিক আছে। লেকিন হামারা বিশোয়াস হ্যায়—

মোতিবাবু। কি বিশ্বাস?

ঝুনঝুনওয়ালা। আপকো পূর্ব্বপুরুষ মাড়োয়ারসে বঙাল দেশমে আয়া হ্যায়।

এমন সময়ে পিছন দিকে একটা সোরগোল শুনা গেল, একদল লোক প্রবেশ করিতেছে, ছেলে বুড়া যুবক; সকলের আগে এক অশীতিপর বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, অন্ধ, বোধ হয় কানেও শুনিতে পায় না, লাঠি ধরিয়া কোন রকমে হাঁটিতেছে। সকলে পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছে, ইনি কে? প্রেসিডেণ্ট নাকি? মোতিবাবুও এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন

মোতিবাবু। মশায়, ইনি কে?

সেই ব্যক্তি। কি আশ্চর্য্য, এঁকে চেনেন না! ইনি কলকাতার খবরের কাগজের হেড রিপোর্টার।

মোতিবাবু। এখানে কেন?

সেই ব্যক্তি। আজকার সভার রিপোর্ট পাঠাবেন।

মোতিবাবু। ইনি কি ক'রে রিপোর্ট পাঠাবেন? চোখে দেখতে পান না, বোধ হয় কানেও শুনতে পান না।

সেই ব্যক্তি। বোধ হয় কেন? কানে মোটেই শুনতে পান না।

মোতিবাবু। তবে লিখবেন কি ক'রে?

সেই ব্যক্তি। চোখে দেখতে পেলেও লিখতেন না;

মোতিবাবু। কেন?

সেই ব্যক্তি। কারণ, লিখতে জানেন না।

মোতিবাবু। লিখতে জানেন না!

সেই ব্যক্তি। এবং পড়তেও জানেন না।

মোতিবাবু। তবে কি ক'রে রিপোর্টারের কাজ করেন?

সেই ব্যক্তি। মহাভারতের সঞ্জয়ের মত এঁর দিব্যদৃষ্টি আছে। এখানে কি হবে তা তিনি অনেক আগেই জানেন। কাজেই কলকাতায় ব'সে রিপোর্ট লিখে কাগজে দিয়ে তবে এসেছেন।

ঝুনঝুনওয়ালা। শালা বঙালী আচ্ছা জার্ণালিস্ট হ্যায়!

এই দল ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে সরিয়া গেল। এমন সময়ে শঙ্খধ্বনি হইল, জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রেসিডেন্ট আসিতেছেন। প্রেসিডেন্টকে অনুসরণ করিয়া একটি বিশিষ্ট জনতা প্রবেশ করিল (ক) প্রেসিডেন্ট, নাম নরোত্তম বসু এক সময়ে ইনি কোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এখন নানাস্থানে নানা উপলক্ষ্যে সভাপতিত্ব করাই এঁর পেশা; বৃদ্ধ, মাথায় কুঞ্চিত চুল; এরোপ্লেনে আসিয়াছেন; পায়ে মোজা, গায়ে ওভারকোট, গলায় গলাবন্ধ, চোখে নীল গগ্‌লস্। (খ) ডক্টর মৃৎসুদ্দি, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক; বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; পরণে ট্রাউজার ও গলাবন্ধ কোট; অল্পদিন হইল বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন; ইনি বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনকে জগতের শ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়া মনে করেন; কাজেই লোকে এঁর উপনাম রাখিয়াছেন—১৯০৫। (গ) ডক্টর ভবভূতি শর্ম্মা, ইনিও একজন অধ্যাপক, তবে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, কারণ পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। 'বৃহত্তর কলিকাতা-সমিতির ইনি প্রতিষ্ঠাতা, সম্প্রতি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্লেটোনিজ্‌ম ও ভারতীয় ধানা' সম্বন্ধে বিখ্যাত তুলনা-মূলক বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। (ঘ) গদাধর বসু, ইনি কাউন্সিলের নেতা, মন্ত্রীসঙ্ঘ-গঠনের পূর্ব্বে গোপালদেবের স্মৃতি-সভা হইতে অনুপ্রেরণালাভের জন্য আসিয়াছেন।

গোপালদেব ছাড়া নাকি বাংলা দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই।

এঁদের সঙ্গে কাগজের রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফ তুলিবার লোক আছে; প্রত্যেকের বক্তৃতা ও ছবি কলিকাতার কাগজে এবং সম্ভব হইলে লণ্ডনের খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে। ইহা ছাড়া সিনেমা কোম্পানি উৎসবের ছবি তুলিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের দুই পাশে দুই জন, কল্যাণ ও সুভদ্রা

নরোত্তম। আমার রিপোর্টার এসেছে?

কল্যাণ। আজ্ঞে, সে ঠিক আছে।

নরোত্তম। আমার ক্যামেরাম্যান কোথায়?

কল্যাণ। আজ্ঞে, সে তৈরি আছে।

নরোত্তম। তাকে ব'লে দিন, আমার অন্তত খান ছয়েক ছবি তোলা চাই। কলকাতার কাগজে ছাড়াও ইংল্যাণ্ড আমেরিকা আর কন্টিনেণ্টে পাঠাতে হবে।

কল্যাণ। আজ্ঞে, সে সব ঠিক ক'রে দিয়েছি।

নরোত্তম। যাক, তবে বোধ হয় এবার সভার কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

সভাপতিকে মালা দিয়া বরণ করা হইল; সভাপতি একটি মালা লইয়া গোপালদেবের স্তম্ভের উপরে রাখিলেন, সকলে করতালি দিল

কল্যাণবাবু, ছবিতোলা ঠিক হয়েছে তো?

কল্যাণ। নিশ্চয়। ফোটোগ্রাফারদের বিশ্রাম নেই।

নরোত্তম। তবে আপনি ভূমিকা ক'রে সভার সূচনা ক'রে দিন।

সুভদ্রা। সভাপতি মহাশয় ও সভ্যগণ! আপনারা স্বাগত হোন। গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতির সাদর অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন। আজ যে উপলক্ষ্যে এখানে আপনারা সমবেত, তা জানেন। বাংলা দেশের এই দুর্দ্দিনে বাংলা দেশের জনগনের দ্বারা নির্ব্বাচিত মহারাজ গোপালদেব ছাড়া আর কেউ তার রক্ষাকর্ত্তা নেই; আজ

আমরা তাঁরই স্মৃতিকল্পে এই গোপালদেবের স্তম্ভের পাদমূলে সমবেত।

করতালি

এবার সভাপতি মশায় এ সম্বন্ধে আপনাদের বলবেন।

নরোত্তম। সভ্য মহোদয়গণ! কি আর বলব, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ, অশ্রুতে এবং ছানিতে চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট, কিন্তু কাঁদতে পারি কই? এক সময়ে কাঁদতে পারতাম, চণ্ডীদাসের কত পুঁথি আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি; চোখের জলে তার অক্ষর মুছে গেছে, শেষে নিজের কবিপ্রতিভা দিয়ে নূতন ক'রে পদাবলী বানিয়েছি। হ্যাঁ, কাঁদতে শিখিয়েছিলেন বটে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব; তখন বাংলা দেশে সে কি কান্নার রোল, সেই অশ্রুবন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।' আজ তেমন ক'রে কাঁদতে পারি কই? বাঙালী, তুমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছ, আবার কাঁদতে শেখ, সব ফিরে পাবে; রাজ্য পাবে, ধন পাবে, পদাবলী পাবে, মহাজন পাবে। বাঙালী, তুমি কাঁদতে ভুলেছ ব'লেই সেই গৌড় নেই, সেই গৌরাঙ্গ নেই, সেই চণ্ডীদাস নেই, সে চৈতন্যচরিতামৃত নেই, সে ঢাকাই অমৃতি নেই। নাঃ, নাঃ, আর পারছি না।

সভাপতি কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন। করতালি। চোখ হইতে রুমাল সরাইয়া বলিলেন

আমার ছবি তোলা হয়েছে তো? ওঃ, আসল কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, গোপালদেব, তুমি এস, আবার কাঁদতে শেখাও।

সুভদ্রা। এবার বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মুৎসুদ্দি বক্তৃতা করবেন।

জনতার মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল

একজন। বেচুয়ানাল্যাণ্ডের ডক্টর?

মুৎসুদ্দি। ও কথা কে বললেন? যদি বাপের বেটা হও, এগিয়ে এস। আর এগিয়ে এস গোপালদেব, শুনেছি তুমি মরদ ছিলে। আমি চাই 1905। আমি সেই 1905। আমি নয়া। দুনিয়ার বাজারে আমি নয়া। পুরাতনের ঘাড়ে মারি আমি দশ পয়জার, বেরিয়ে আয় ওই থামের ভেতর থেকে গোপালদেব; যদি তুই হ'স বাপের বেটা। আজ তোর একদিন, আর আমার একদিন। তুই বকেয়া, আর আমি 1905। চ'লে আয় গোপালদেব, যদি মরদ হ'স, না হ'লে মারি আমি দশ পয়জার, আমি 1905!

এই বলিয়া তিনি তাল ঠুকিয়া, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন, যেন গোপালদেব বাহির হইলেই কুস্তি লড়িবেন

আমার ছবি তোলা হয়েছে তো?

সুভদ্রা। এখন বলবেন বিখ্যাত বৃহত্তর-কলিকাতা-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডক্টর ভবভূতি শর্ম্মা।

ভবভূতি। বন্ধুগণ! হনলুলু দ্বীপে গিয়ে বুঝলাম যে, ভারতবর্ষ কত মহৎ, সেখানেও সে তার বাণী প্রেরণ করেছিল একদা। সে বাণী রূপ নিয়েছিল মন্দিরে নয়, স্থাপত্যে নয়, মূর্ত্তিতে নয়, ধামার মধ্যে, নিছক বেতে বোনা ধামাতে। আমি ভারতীয় বাণীর প্রতীক সেই ধামা ধারণ ক'রে দেশে বিদেশে ঘুরেছি।

জনতা হইতে। ধামা কি ভরল দাদা?

ভবভূতি। আজ বুঝেছি গোপালদেব, একদা তুমিও ধারণ করেছিলে সেই ধামা। আজ বৃহত্তর বাঙালী ধামা ধরতে ভুলে গিয়েছে; তাই তার ধন নেই, মান নেই, বিদ্যা নেই, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নেই।

এস গোপালদেব, তোমাকে আহ্বান করছি, বৃহত্তর বাঙালীর নামে, বৃহত্তর কলিকাতা সমিতির নামে, যে বাঙালী একদা ধামা ধরতে জানত তার নামে তুমি এস, তুমি গৌড়কে মহা গৌড়ে, বাংলাকে বৃহত্তর বাংলায় পরিণত কর। তুমি ছাড়া আর কে বাঙালীকে রক্ষা করবে ?

করতালি

আমার ছবি তোলা হয়েছে তো ?

সুভদ্রা। এবার কাউন্সিলের বিখ্যাত নেতা গদাধর বসু বক্তৃতা করবেন।

গদাধর। পরম ভট্টারক মহারাজ গোপালদেব, তোমাকে বাংলা দেশের আজ বড় প্রয়োজন। একদিন তুমি মাৎস্য-ন্যায় থেকে, অন্যায় অত্যাচার থেকে বাংলা দেশকে রক্ষা করেছিলে, আজ আমরা পুনরায় মাৎস্য-ন্যায় দ্বারা পীড়িত।

তুমি গৌড়বাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েছিলে, আমিও বঙ্গবাসী দ্বারা নির্ব্বাচিত। আজ নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পূর্ব্বে এসেছি তোমার স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে। হে গণরাজ, হে গোপালদেব, তুমি ব'লে দাও, মনে নির্দ্দেশ দাও, কাকে করব আমরা প্রধান মন্ত্রী ; যারা নির্ব্বাচিত হয়েছে, তারা সকলেই দেশের উন্নতির জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, কেউ কারও চেয়ে অল্প উন্নতি করতে রাজি নয়, সকলেই মাসিক নগদ তনখার পরিবর্ত্তে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত। এতগুলি মহাপ্রাণের মধ্যে কাকে বাদ দিয়ে কাকে প্রধান মন্ত্রী করি ? তাই এসেছি আজ তোমার নিকটে, হে গৌড়ের ত্রাণকর্ত্তা, তুমি আমার মনে জ্ঞানের সঞ্চার কর। ব'লে দাও, কে সেই মহাপ্রাণ, যাকে প্রধান পদ দিতে পারি, যে পদে

একদা তুমি অধিষ্ঠিত হয়ে এই দেশকে রক্ষা করেছিলে ? বল রাজন, বল সম্রাট, বল গণনায়ক, কে আছে তোমার উত্তরপুরুষ, কে আজ বাংলার ত্রাণকর্ত্তা ?

জনতার মধ্য হইতে। বেটা বলছে ভাল।

অপর একজন। ওরা বলে তো ভাল, করে না কিছু।

অন্য একজন। কাজ করতে না হ'লে আমরাও ভাল বলতে পারি।

গদাধর। আমার ছবি তুলতে যেন ভুল না হয়।

সুভদ্রা। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন—

ঝুনঝুনওয়ালা। সভাপতি মহাশয়, হামি ভি এক বাত বঙাল ভাষামে বল—বল—উস্‌কো ক্যা বোলতা হ্যায়! আপ তো সমঝ লিয়ে।

হামি ইতিহাসমে পাঠ কিয়া হ্যায় যে, গোপালদেব বড়া ভারী রাজা থা। আউর প্রজাকোঁ বাস্তে বহুৎ কাম কিয়া থা। গোপালদেব খাদ্যমে ভেজাল দেনাকে বিরুদ্ধে আইন কিয়া থা। উসমাফিক আইন করনা চাহিয়ে। আভি তো ডালমে, চালমে, তেলমে, ঘিউমে ভেজাল ডালতা হ্যায়। ইসকো বিরুদ্ধে আইন হোনা চাহিয়ে। জরুর চাহিয়ে। লেকিন যেতনা রোজ আইন না হোইতেছে, আপলোককোঁ যদি পবিত্র ঘিউ খরিদ করনা জরুরৎ হ্যয়, তব ঝুনঝুনওয়ালা নারায়ণদাসকো দোকানমে যাইয়ে, ৩৬৫ নম্বর হ্যারিসন রোড, হাবড়া পুলকা পাশ।

আপলোক অনুগ্রহ করকে ঠিকানা লিখ লিজিয়ে। হামারা দোকানকো পাশ বহুৎ ঘিউকা দোকান হ্যায়, উসিমে মৎ যাইয়ে; উ লোক সাঁপকা চর্ব্বি ঘিউমে ডালতা হ্যায়।

জনতা হইতে। শালা, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

ঝুনঝুনওয়ালা। আরে ভাই, হামারা তসবির মৎ তুলিয়ে, হাম দাম দেনে শকেগা নেহি।

কল্যাণ। সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ! আজ আপনারা সকলে গোপালদেবের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেছেন। এক্ষণে আমি গৌড়ীয়-পুরাতত্ত্ব-গবেষণা-সমিতির পক্ষ থেকে একখানা প্রশস্তিপত্র পাঠ করব।—

পরমভট্টারক পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজ গোপালদেব, তুমি আবার আগমন কর। তোমার গৌড় আজ নানা অত্যাচারে পীড়িত; মাৎস্য-ন্যায় পুনরায় ভীষণতর মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বাংলা দেশকে গ্রাস করছে।

সেদিন তুমি প্রবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করেছিলে, মহাজনের হাত থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করেছিলে, ব্যবসায়ীর হাত থেকে গৃহস্থকে রক্ষা করেছিলে, ধনী অভিজাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে গৌড়ের ভবিষ্যৎ। সেদিন তুমি অবহেলা অত্যাচার থেকে গৌড়বাসীকে রক্ষা করেছিলে, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ হয়েছিল, পথে আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়েছিল, রাত্রিতে সঙ্গীতের নামে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করা বন্ধ হয়েছিল।

আজ বাংলা দেশের অবস্থা সেই দিনের মত, তাই আজ আবার তোমার পুনরাবির্ভাব আবশ্যক। আমরা, বাংলা দেশের প্রতিনিধিগণ, তোমার স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে সমবেত হয়ে, নিজেদের নামে, বাংলা দেশের নামে, মানবতার নামে তোমার আগমনের প্রার্থনা জানাচ্ছি। তুমি এস, বাংলাকে রক্ষা কর, বাঙালীকে রক্ষা কর, মনুষ্যসমাজকে উদ্ধার কর। গীতার বাণী যদি সত্য হয়, 'সম্ভবামি যুগে যুগে' যদি মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয় জানি,

তুমি আবার আসবে, বাংলা দেশ সেই শুভলগ্নের জন্য অপেক্ষা করছে।

কল্যাণ প্রশস্তি পাঠ শেষ করিল ; এমন সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড সকলে লক্ষ্য করিল ; লিখিতে গেলে তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে। গোপালদেবের যে স্মৃতিস্তম্ভ কুয়াশার সূক্ষ্ম মলমলে আবৃত ছিল, সেই স্তম্ভের মূলে এক বিরাট মানবমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; তাহাকে স্পষ্ট দেখিবার উপায় নাই ; কুয়াশার আবরণ তাহাকে অর্দ্ধ-অশরীরী করিয়া রাখিয়াছে, সে ছায়া বাস্তব ও কল্পনা রাজ্যের সীমান্তচারী। সমবেত জনতা ভীত বিস্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল ; কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না ; মূর্ত্তিই প্রথমে কথা বলিল, তাহার কণ্ঠস্বরে প্রাণের সজীব মূর্চ্ছনা নাই, কেমন যেন একটানা, কেমন যেন গম্ভীর, মনে হয় কোন গভীর অতল হইতে উঠিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্যতম লোকটি পর্য্যন্ত সভয়ে সত্বর কোন না কোন একটি ছুতা দেখাইয়া প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বৃহৎ সভাস্থলে মূর্ত্তি ও অপর একটি লোক, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই হেড রিপোর্টার ছাড়া আর কেহ নাই

মূর্ত্তি। গৌড়বাসী, আমি গোপালদেব। তোমাদের কাতর আহ্বান শুনেছি ; আমি কি সত্যই আবার আবির্ভূত হব ?

প্রেসিডেণ্ট। আমার একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে, চললাম। [প্রস্থান]

মুৎসুদ্দি। 1905 আমাকে ডাক্ দিচ্ছে, চললাম। [প্রস্থান]

ভবভূতি। মাই গড ! আর দেরি হ'লে যাভাযাত্রী জাহাজ ধরতে পারব না, চললাম। [প্রস্থান]

গদাধর। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছে, কালকে কাউন্সিলের সিটিং, চললাম। [প্রস্থান]

ঝুনঝুনওয়ালা। হেঁ হেঁ মোতিবাবু, এ ট্রেন মিস করলে হামার রিটার্ণ-টিকিটের মেয়াদ চলা যায়গা, হামি চললাম। [প্রস্থান]

মোতিবাবু। ছেলেটার অসুখ দেখে এসেছিলাম, না জানি তার কি হ'ল, চললাম। [প্রস্থান]

কল্যাণ। চাঁদা না দিয়ে সবাই স'রে পড়লেন, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না, চললাম। [প্রস্থান]

সুভদ্রা। রিপোর্টাররা কি রিপোর্ট কাগজে দেয়, একবার দেখা দরকার, চললাম। [প্রস্থান]

ক্যামেরাম্যান, ফোটোগ্রাফার ও রিপোর্টাররা যন্ত্রপাতি ফেলিয়া প্রস্থান করিল। সভাস্থল প্রায় নির্জ্জন, কেবল বৃদ্ধ হেড রিপোর্টার ও মূর্ত্তি ব্যতীত। ইহাদের আচরণে গোপালদেব স্তম্ভিত হইয়া গেল। এইমাত্র ইহারা আর্ত্ত অনুরোধে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে আসিবামাত্র কেন যে তাহারা এমন দ্রুত পলায়ন করিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

গোপালদেব দেখিল, বৃদ্ধ রিপোর্টারটি পলায় নাই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল

গোপালদেব। তুমি যে পালালে না?

হেড রিপোর্টার। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ব'লেই পালাই নি।

গোপালদেব। কি কথা?

হেড রিপোর্টার। ইতিহাসে পড়েছি, তুমি মস্ত লোক ছিলে; কিন্তু এখন দেখছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, যাকে বাঙালী বলে, সেন্স অব হিউমার।

গোপালদেব। বৎস?

হেড রিপোর্টার। তা নয় তো কি? তুমি কি এদের বক্তৃতাকে সত্যি মনে করেছিলে?

গোপালদেব। সত্য নয়?

হেড রিপোর্টার। মোটেই নয়।

গোপালদেব। তবে এমন ক'রে সবাই বলছিল কেন?

হেড রিপোর্টার। না বললে চলে না ব'লে বলছিল। এই রকম উৎসব না করলে ইউরোপের লোকে সভ্য মনে করে না ব'লে এরা করছিল। লণ্ডনের লোকে এই উৎসবের বর্ণনা প'ড়ে অবাক হয়ে যাবে ব'লে করছিল। তোমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে করে নি।

গোপালদেব। আমি ফিরলে ক্ষতি ছিল কি?

হেড রিপোর্টার। বল কি! এদের তা হ'লে সমূহ সর্ব্বনাশ। তুমি ফিরলে এরাই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াত। এরা নিশ্চিত জানত, তোমার ফেরবার কোন আশঙ্কা নেই, তাই তোমাকে আহ্বান করছিল।

গোপালদেব। তা হ'লে কি গৌড়ের মাৎস্য-ন্যায়কারীদের বংশ আজও লোপ পায় নি?

হেড রিপোর্টার। কালের গতিকে আরও বেড়েছে।

গোপালদেব। তবে বাঙালীকে বাঁচাবে কে?

হেড রিপোর্টার। তুমি কি ভাবছ, বাঙালী আজও বেঁচে আছে?

গোপালদেব। বাংলা দেশ সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে।

হেড রিপোর্টার। কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, সেদিন গোপালদেব ছিল, আজ গোপালদেব নেই।

হেড রিপোর্টারের কথাবার্ত্তা শুনিয়া গোপালদেবের মূর্ত্তি আর্ত্ত বেদনায় 'উঃ' করিয়া একটি অব্যক্ত শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। এইমাত্র যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া গেল, সভাস্থলে তাহার কোনও চিহ্ন রহিল না। হেড রিপোর্টার লাঠি ঠকঠক করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা কম অলৌকিক নয়। সভাস্থলের পিছনে যে নিমগাছ ছিল, হঠাৎ তাহার ডাল-পালা নড়িয়া উঠিল; তাহারই এক উচ্চ শাখায়

অন্তরাল হইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অর্দ্ধপ্রকাশিত হইয়া দূরে গত জনতাকে ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল ; এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, বঙ্গীয় অ্যাসেম্ব্লির সদস্য শ্রীমন্ত চাটুজ্জে

শ্রীমন্ত। শৃন্বন্তু বিশ্বে, বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্। ভো ভো বঙ্গবাসী, তোমরা শ্রবণ কর, আমি রাজনীতির চরম রহস্য জেনেছি ; আর কোন চিন্তা নেই, কেবল অবধান কর।

তাহার চীৎকার শুনিয়া জনতা ধীরে ধীরে পুনরায় প্রবেশ করিতে লাগিল ; প্রথমে ভীত, পরে বিস্মিত, শেষে আনন্দিত ভাবে তাহারা শ্রীমন্তের বাণী অবধান করিতে লাগিল। প্রেসিডেন্ট, মুৎসুদ্দি, ভবভূতি, গদাধর, সিনেমা কোম্পানির লোক, ক্যামেরাম্যান ও খবরের কাগজের রিপোর্টারগণের পুনঃপ্রবেশ ; সকলের শেষে কল্যাণ ও সুভদ্রা

বাঙালী, তোমরা কি চাও ?

গদাধর। কাউন্সিল সাগর উত্তীর্ণ করতে পারে এমন রাষ্ট্রনায়ক চাই।

শ্রীমন্ত। তবে আমাকে ছাড়া উপায় নেই।

প্রেসিডেন্ট।
গদাধর।
মুৎসুদ্দি।
ভবভূতি। } আপনি ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, আমি।

গদাধর। আপনার কি কি গুণ আছে ?

শ্রীমন্ত। যাচাই ক'রে নাও।

গদাধর। আপনি নির্ব্বাচনের সময়ে যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আশা করি তা ভঙ্গ করেছেন ?

শ্রীমন্ত। এখনও সুযোগ পাই নি, প্রথম সুযোগেই ভঙ্গ করব।

জনতার করতালি

গদাধর। আপনি বাককৌশলের ডিগবাজি খেয়ে দেশকে চমৎকৃত ক'রে দিতে পারেন ?

শ্রীমন্ত। একবার কেবল সুযোগ দিয়ে দেখ।

জনতার করতালি

গদাধর। আপনি যুক্তির বলে নিজের স্বার্থকে দেশের স্বার্থ ব'লে দেখাতে পারেন ?

শ্রীমন্ত। তা না পারলে আর এতদিন কি শিখলাম !

জনতার করতালি

গদাধর। আপনি সত্যের সঙ্গে মিথ্যার ভেজাল মিশিয়ে কাজ চালাতে পারেন ?

শ্রীমন্ত। না।

গদাধর।
প্রেসিডেন্ট।
মুৎসুদ্দি।
ভবভূতি।
} কি সর্ব্বনাশ ! পলিটিক্সে সত্য কথা !

শ্রীমন্ত। অত চিন্তিত হয়ো না। আমি বিনা ভেজালে মিথ্যা কথা ব'লে থাকি। ওর সঙ্গে সত্য মেশাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল হয়, নিছক মিথ্যার মত এমন সত্য অল্পই আছে।

জনতার করতালি

গদাধর। আমরা তো এমন জানতাম না। আচ্ছা, দেশের উন্নতির জন্যে কোন প্রোগ্রাম আপনার আছে ?

শ্রীমন্ত। সমস্ত প্রস্তুত, কেবল একবার দেশের উন্নতি করবার সুযোগ দাও।

গদাধর। যে উদ্দেশ্যে আজ এখানে এসেছিলাম, তা সফল হ'ল। আমরা নেতা পেয়েছি, আপনাকেই করব আমাদের প্রধান মন্ত্রী।

শ্রীমন্ত। অত ব্যস্ত হয়ো না বন্ধুগণ। আমার আসল গুণ এখনও অবগত হও নি।

সকলে। বলুন, বলুন।

শ্রীমন্ত। আমি হাত-পা বেঁধে সাড়ে চুয়াত্তর ঘণ্টা হেদোর জলে ভাসতে পারি। তোমাদের আর কোন নেতা তা পারে?

জনতা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'না না।'

আমি মাটিতে শাবল পুঁতে তার ওপরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আর কোন নেতা তা পারবে?

জনতার করতালি ও 'না না' ধ্বনি

আমি জাহাজের মাস্তুলের ওপরে ছাব্বিশ দিন ব'সে ছিলাম। এ রকম রেকর্ড আর কোন নেতার আছে?

জনতার করতালি ও 'না না' ধ্বনি

আর এই দেখ, এই নিমগাছে আজ আটাশ দিন অনাহারে ব'সে পৃথিবীর সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছি। আর কেউ তা পেরেছে?

জনতার করতালি ও 'না না' ধ্বনি

আমি যে সব রেকর্ডের কথা বললাম, মুসোলিনি তার কোনটা পারে না, হিট্‌লার তার কোনটা পারে না। অবধান কর বাঙালী, আমিই তোমাদের নেতা, তোমাদের উপযুক্ত প্রধান মন্ত্রী।

জনতা দীর্ঘকালব্যাপী উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল ও করতালি দিল

মুৎসুদ্দি। 1905। 1905 আবার ফিরে এসেছে।

প্রেসিডেণ্ট। কই, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় তো এমন দেখি নি।

ভবভূতি। উঁহু, হনলুলুতেও এমন কখনও শুনি নি!

গদাধর। আমাদের সৌভাগ্য যে এঁর মত নেতা পেলাম।

গদাধর।
প্রেসিডেণ্ট।
মুৎসুদ্দি।
ভবভূতি। } দয়া ক'রে আপনি নেমে আসুন

তখন শ্রীমন্ত নিমগাছ হইতে নামিতে আরম্ভ করিল, আর চারিদিক হইতে ছবি-ওয়ালারা ছবি তুলিতে লাগিল; সিনেমার লোকেরা চলচ্চিত্র গ্রহণ করিতে শুরু করিল; রিপোর্টারগণ সংবাদ লিখিয়া নিজ নিজ কাগজে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল; আর নেহাৎ বেকারগণ খাতা লইয়া শ্রীমন্তর কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া অটোগ্রাফ দাবি করিতে আরম্ভ করিল; শ্রীমন্তও অটোগ্রাফ লিখিয়া দিতে লাগিল। শ্রীমন্ত নামিয়া আসিলে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল

গদাধর। এঁকে নিয়ে যাওয়া যায় কিসে?

প্রেসিডেণ্ট। এরোপ্লেনে।

ভবভূতি। মোটরে।

মুৎসুদ্দি। ওসব কিছুই নয়। যদি মরদ হ'স, তবে তোকে নিয়ে যাব ঘাড়ে ক'রে, আমি হচ্ছি 1905.

শ্রীমন্ত। এই তো চাই। পলিটিক্স মানেই একজনের ঘাড়ে আর একজনের ওঠা।

তখন সকলে মিলিয়া ডাল-পালা ও বাঁশ দিয়া একটা মাচার মত তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর শ্রীমন্তকে বসাইয়া সকলে মিলিয়া সেটাকে ঘাড়ে করিল

গদাধর। চল, সকলে মিলে এবার জাতীয় সঙ্গীতটা গাইতে গাইতে যাওয়া যাক।

প্রেসিডেণ্ট। কোন্ গান? বন্দে মাতরম্?

গদাধর। ওটা তো আজকাল বাতিল। সেই নতুনটা ধর।

এই বলিয়া সে নিজেই আরম্ভ করিল, তারপরে সকলে ধরিল

গান

"পল্লী বালিকা বনপথে যায়—
ঠমকি ঠমকি ভীরু ভীরু চায়।"

গান গাহিতে গাহিতে শ্রীমন্তকে ঘাড়ে করিয়া জনতা প্রস্থান করিল; কেবল রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে দুইজন অবশিষ্ট রহিল, কল্যাণ ও সুভদ্রা; তাহারা পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া আসিল

সুভদ্রা। সব ভেঙ্গে গেল।

কল্যাণ। আপনি কি সভার কথা বলছেন?

সুভদ্রা। আপনি তো কেবল সভাই দেখছেন।

কল্যাণ। আর কি দেখব বলুন?

সুভদ্রা। কি দেখবেন? বাংলা দেশের দুর্দ্দশা দেখছেন না?

কল্যাণ। দুর্দ্দশা কোথায়?

সুভদ্রা। অযোগ্য লোকেরা বড় বড় পদ পাচ্ছে, এর চেয়ে আর কি দুর্দ্দশা হ'তে পারে?

কল্যাণ। বাংলা দেশ নেতা চেয়েছিল, নেতা পেয়েছে; আমাদের সমিতির উদ্যোগেই এটা সম্ভব হ'ল, আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।

সুভদ্রা। আপনি আনন্দিত হোন; আমি চললাম।

কল্যাণ। চলুন, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু শ্রীমন্তর সৌভাগ্যে এত দুঃখিত হচ্ছেন কেন?

সুভদ্রা। দুঃখিত?

কল্যাণ। তবে কি ঈর্ষা ?

সুভদ্রা। লোকটা ঠগ।

কল্যাণ। কিন্তু আপনাকে তো ঠকাতে পারে নি ?

সুভদ্রা। চুপ করুন, ও কথা আর নয়।

কল্যাণ। দেখুন !

সুভদ্রা। আবার কি বলছেন ?

কল্যাণ। ওকথা আর নয়। সম্পূর্ণ নূতন কথা।

সুভদ্রা। বলুন।

কল্যাণ। সুভদ্রা দেবী !

সুভদ্রা। মনে রাখবেন, এ সমিতির আমি সেক্রেটারি. আপনি ট্রেজারার ; অফিশিয়ালি আমাকে নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার আপনার নেই ?

কল্যাণ। অফিশিয়ালি নয়, নেহাৎ পার্সনালি ডাকছি।

সুভদ্রা। আচ্ছা. কি বলুন ?

কল্যাণ। দেখুন, অযোগ্য লোকেরাই এ সংসারে জিতে থাকে।

সুভদ্রা। আবার শ্রীমন্তবাবুর কথা !

কল্যাণ। ভুল করছেন, এবারে আমার কথা, আমিও একজন অযোগ্য লোক।

সুভদ্রা। যদি কোন আবেদন থাকে তো লিখে জানাবেন।

কল্যাণ। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সে কথা কালির অক্ষরে দেখলে লাল হয়ে উঠবেন।

সুভদ্রা। আপনাকে নিয়ে পারা মুস্কিল। বলুন, কি বলবেন ?

কল্যাণ। যদি আমাকে অযোগ্য না মনে করেন—

সুভদ্রা। অযোগ্য মনে করি নি ব'লেই তো ট্রেজারারের পদ দিয়েছি।

কল্যাণ। আরও উচ্চতর পদের জন্য হৃদয় ব্যাকুল।

সুভদ্রা। এ তো অফিশিয়াল কথার মত শোনাচ্ছে না!

কল্যাণ। ঠিক ধরেছেন, অফিশিয়াল কথা এ মোটেই নয়।

সুভদ্রা। আমি নির্ব্বোধ নই।

কল্যাণ। আমি এমন আভাস মোটেই দিই নি।

সুভদ্রা। আপনার কথা বুঝতে পারি নি এমন নয়। মনে রাখবেন, বিবাহ করব না, এই সর্ত্তে সেক্রেটারি হয়েছি।

কল্যাণ। কিন্তু সেক্রেটারি হয়ে বিবাহ করবেন না, এমন নিষেধ তো কোথাও নেই।

সুভদ্রা। আপনার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

কল্যাণ। এবং আশা অত্যুচ্চ।

সুভদ্রা। আপনার প্রস্তাব অশোভন।

কল্যাণ। এবং আমি অত্যন্ত অযোগ্য। ভেবে দেখুন, এতে কত অসুবিধে, ট্রেজারার ও সেক্রেটারির মধ্যে ওই রকম একটা সম্বন্ধ হ'লে হিসাব দেখাবার বা তাবিল গরমিল হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না।

সুভদ্রা নীরব

আমি উকিলের পরামর্শ নিয়েছি, এতে আইনের কোন বাধা নেই; সমিতি যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

সুভদ্রা। না না না। কি, হাসছেন যে?

কল্যাণ। আপনার আপত্তির উগ্রতা দেখে।

সুভদ্রা। আরও উগ্রভাবে বলছি, না না না।

কল্যাণ। আর উগ্রভাবে বলতে হবে না, মনের কথা বুঝে নিয়েছি। চল, এবার যাওয়া যাক।

সুভদ্রা। ট্রেজারার করবার সময়েই আশঙ্কা হয়েছিল, এই রকম একটা গোলমাল হবে তোমাকে নিয়ে।

কল্যাণ। অসাবধানে মনের কথা ফাঁস হয়ে গেল ওই 'তোমার' শব্দে।

সুভদ্রা। যেন এর আগে কিছু বোঝ নি! আমি চললাম।

দ্রুত প্রস্থান

কল্যাণ। [ডাক দিয়া] রাগ ক'রে আগে গিয়ে লাভ নেই। আমি না গেলে মোটর ড্রাইভ করবে কে?

দ্রুত প্রস্থান

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি

১। বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ একজন রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে উড়িষ্যায়, বঙ্গে এবং পূর্ব্বদেশের অন্য পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রজাপুঞ্জ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজনির্ব্বাচন করিয়াছিল। প্রজাবৃন্দ যাহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার নাম গোপালদেব।—পৃ. ১৬২-৬৩

*　　　*　　　*

২। দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতিকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল, প্রজাবৃন্দ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে বিখ্যাত, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতি-পুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমারজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপালকুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা

বপ্যাট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" মাৎস্যন্যায় বলিতে অরাজকতা বুঝায়।—পৃ. ১৭১

* * *

৩। মগধের গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের মৃত্যুর পরে, গৌড়-মগধ-বঙ্গে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, কামরূপাধিপতি হর্ষদেব, গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ, ও রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসকার লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; "প্রতিদিন একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদলাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" তারানানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশ মাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।—পৃ. ১৭৩-১৭৪

* * *

৪। গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বারংবার বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন প্রজাবৃন্দকে অরাজকতা ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা

করাই বোধ হয় প্রথমে গোপালদেবের রাজ্যকালের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল।—পৃ. ১৭৫

*　　　*　　　*

৫। অনুমান হয়, গোপালদেব ৭৮৫—৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।—পৃ. ১৭৮

*　　　*　　　*

৬। গোপালদের ৭৯০—৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন।—পৃ. ১৭৮

[রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার ইতিহাস', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), সপ্তম পরিচ্ছেদ, পালবংশের অভ্যুদয়।]

নাটকের টেকনিক

১। বাংলা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যিক নিজের রচনার টেক্‌নিককে অভিনব বলিয়া দাবি করেন; কাজেই সে দাবি আমার করিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এই নাটকের টেক্‌নিক অভিনব না হইলেও অদ্ভুত।

নাটকটি দুই অংশে বিভক্ত—প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ নয়, উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ।

প্রত্যেক অঙ্কে দুটি করিয়া দৃশ্য। প্রথমটির কাহিনী অষ্টম শতকের, দ্বিতীয়টির কাহিনী বর্ত্তমানের—বিংশ শতকের। তিন অঙ্ক ধরিয়া এই ভাবে চলিয়াছে। শেষতম দৃশ্যে দুটি কাহিনীর গ্রন্থিকে এক করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বারো শত বছরের পার্থক্য যে দুই কাহিনীর মধ্যে, সময়ের দিক দিয়া তাদের মধ্যে মিল থাকিতে পারে না, কিন্তু আইডিয়ার ঐক্যে তারা গ্রথিত।

ক, খ, গ দৃশ্যের ডিমক্রেসি সার্থক ; কারণ সে ডিমক্রেসিকে সফল করিয়া তুলিতে পারে, এমন একজন লোকের অভ্যুদয় তখন হইয়াছিল। চ, ছ, জ দৃশ্যের ডিমক্রেসি ব্যর্থ, কারণ বর্ত্তমান গণ-আন্দোলনে গণেশের অভ্যুদয় আজিও হয় নাই। উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধের মধ্যে এই দ্বন্দ্বরস বা Irony আছে ; এই Ironyই নাটকটির প্রাণ।

২। ১ম অঙ্ক ২য় অঙ্ক ৩য় অঙ্ক

উপরার্দ্ধ = ক খ গ = অষ্টম শতকের কাহিনী

নিম্নার্দ্ধ = চ ছ জ = বিংশ শতকের কাহিনী

৩। উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও নাটকটি এমন কৌশলে রচিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে কেবল উপরার্দ্ধ বা কেবল নিম্নার্দ্ধের অভিনয় করা চলিতে পারে ; তাতে রসের কোন ব্যাঘাত হইবে মনে হয় না। কেবল যদি ক, খ, গ দৃশ্য অভিনীত হয়, তবে নাটকটি প্রাচীনকালের মনে হইবে ; আবার যদি কেবল চ, ছ, জ দৃশ্য অভিনীত হয়, তবে নাটকটি অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া মনে হইবে কিন্তু তাতে রসের অভাব হইবে না। সম্পূর্ণ রস পাইতে হইলে আদ্যন্ত যথাযথভাবে অভিনয় করা আবশ্যক।

নাটকটীকে দুই স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিলে আরও একটু সুবিধা আছে, একখানা বইয়ের দাম দিয়া দুইখানা বই কিনিবার কাজ হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী *

উৎকৃষ্ট রচনা পড়িলেই বাঙালী পাঠকের মনে হয়, আগাগোড়া চুরি। বাঙালী লেখকের প্রতি বাঙালী পাঠকের কি শ্রদ্ধা! এখনও এমন

* ১১৭ পৃষ্ঠায় গানটি শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক লিখিত।

লোক আছে, যারা মনে করে, *Ivanhoe* পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন।

আমার নাটকটি পড়িলেও কোন কোন পাঠকের সে সন্দেহ হইতে পারে। (যাদের না হইবে, তারা মূর্খ, কারণ সত্যই নানা বই হইতে আমি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।) সত্যের অনুরোধেও বটে, আবার পাঠকদের বিদ্যার প্রতি অনুকম্পাতেও বটে, যে সকল গ্রন্থ হইতে আমি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, তার একটা তালিকা দিলাম।—

বেদ

বাইবেল

বর্ণপরিচয়

ধারাপাত

পুরাণ

রামায়ণ

মহাভারত

বার্নার্ড শ-র নাটকাবলী

মলিয়েরের নাটকাবলী

অ্যারিস্টফেনিসের নাটকাবলী

রবীন্দ্রনাথের কাব্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

মাইকেলের কাব্য

দীনেশ সেনের জড়ভরত

জলধর সেনের হিমালয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা

ঈ. বি. আর. টাইম-টেব্‌ল

রাজভাষা

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা

প্রবাসী

ব্রতচারীর মর্ম্মকথা

গ্রের অ্যানাটমি

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

সোহম্ গীতা

পরলে ককি বাত

আইন্‌স্টাইনের রিলেটিভিটি

আমার নিজের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ